বিজ্ঞান
ভারতী

নব-প্রবর্তিত পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক ১০. ১২. ৫৫ তারিখের ১০ নম্বর টি. বি. বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী **পঞ্চম শ্রেণীর** পাঠ্য হিসাবে অনুমোদিত।

বিজ্ঞান-ভারতী

॥ পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য ॥

ডক্টর **সুধীন্দ্রনাথ সেন,** এম-এস. সি. (ক্যাল.),
ডি. ফিল (ক্যাল.), ডিপ. লেদ (লীড্‌স্),
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন পরীক্ষক।

ও

শ্রীদ্বারকারঞ্জন গুপ্ত, বি-এস. সি.
পূর্বতন ইন্‌স্ট্রাক্‌টর, সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্ট
টেকনিকাল ট্রেনিং স্কীম,
যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজ ও ক্যালকাটা টেক্‌নিকাল স্কুল।

নবীগোপাল চট্টোপাধ্যায় এণ্ড কোং, লিঃ
১।১, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা ৯

॥ প্রকাশক ।
শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়
১।১, বৃন্দাবন মল্লিক লেন
কলিকাতা-৯

*　*

॥ মুদ্রাকর ॥
শ্রীঅমৃতলাল কুণ্ডু
জ্ঞানোদয় প্রেস
১২, মহারানী স্বর্ণময়ী রোড
কলিকাতা ৯

মূল্য—এক টাকা তিন আনা।

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

3920

প্রথম অধ্যায়

গাছপালার কথা

এই পৃথিবীতে আমরা যা কিছু দেখতে পাই, তা মোটামুটি দুটো ভাগে ভাগ করা যায়—(১) **জড় পদার্থ** বা **নির্জীব বস্তু,** অর্থাৎ যার প্রাণ নেই ; আর (২) **সজীব** পদার্থ, অর্থাৎ যার প্রাণ আছে, যা জীবন্ত। জীবন কি, একথা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলা কঠিন। তবে এটুকু বলা যায় যে, যারাই সজীব তাদেরই **জন্ম** আছে, **পুষ্টি** ও **বৃদ্ধি** আছে, বংশবৃদ্ধি আছে এবং **মৃত্যু** আছে। এই সব লক্ষণ যাদের নেই, তাদের জীবন নেই এবং তারা হল জড় পদার্থ।

সমগ্র জীবজগৎকে আমরা প্রধান দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি—(১) **প্রাণী,** আর (২) **উদ্ভিদ** বা গাছপালা। প্রাণী হল তারাই, যারা স্বেচ্ছায় চলাফেরা করতে পারে, যেমন—মানুষ, পশু-পাখি কীটপতঙ্গ, ইত্যাদি। আর উদ্ভিদ হল তারাই, যাদের এই রকম নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই, যেমন—গাছপালা, লতাপাতা, শেওলা, পানা, ইত্যাদি। নিজে থেকে চলাচলের ক্ষমতা না থাকলেও উদ্ভিদেরও অন্যান্য প্রাণীর মতই জন্ম আছে, **পুষ্টি** ও বৃদ্ধি আছে, বংশবৃদ্ধি আছে এবং সর্বশেষে মৃত্যু আছে।

একটা আমের আঁঠি, কি ছোলার দানা, কিংবা অন্য কোন গাছের বীজ মাটিতে পুঁতলে দেখতে পাবে, কয়েক দিন পরেই নতুন গাছের **অঙ্কুর** গজিয়েছে। এ হল বীজ থেকে গাছের

জন্ম। অঙ্কুরটাকে মাটি থেকে তুলে নিলে দেখতে পাবে—বীজ থেকে উপর দিকে যেমন অঙ্কুর বেরিয়েছে, নীচের দিকেও তেমনি **মূল** বা শিকড় নেমেছে। যত দিন যায়, ততই চারাগাছ বাড়তে থাকে। উপরের দিকে দেখা দেয় গাছের কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা, পাতা, ফুল ও ফল; আর মাটির নীচেয় বিস্তৃত হয় মূল, শাখামূল, ইত্যাদি। এ হল গাছের দেহের **পুষ্টি** বা বৃদ্ধি। তারপর, সাধারণতঃ গাছের ফল থেকে বীজ হয় ও বীজ থেকে নতুন নতুন চারাগাছ জন্মায়। এ হল গাছের বংশবৃদ্ধি। এর পর গাছ বুড়ো হলে একদিন তার মৃত্যু হয়। সুতরাং দেখা গেল **জীবনের** সব ক'টি লক্ষণই গাছের বেলায় বিদ্যমান। অতএব গাছপালা সজীব।

পাশের ছবিটি দেখ। মাটির নীচে গাছের গোড়া থেকে সোজা নেমে গেছে **প্রধান মূল**। এই শিকড় সকলের চেয়ে মোটা ও শক্ত। প্রধান মূল থেকে অনেক **শাখামূল** বেরিয়েছে দেখ। আবার মাটির উপরে গোড়া থেকে শক্ত, গোল, মোটা ও শাখাহীন অংশটি হল গাছের **কাণ্ড**। উপর দিকে কাণ্ডের গা থেকে বেরিয়েছে **শাখা-প্রশাখা**। আর শাখা-প্রশাখার গায়ে

ও আগায় রয়েছে অসংখ্য **পাতার** রাজত্ব। শাখা-প্রশাখার গায়ে পাতার ফাঁকে ফাঁকে এক সময় **ফুল** ধরবে, ফুল থেকে **ফল** হবে, আর সেই ফলের মধ্যে থাকবে গাছের ভবিষ্যৎ বংশধরের অগ্রদূত—**বীজ**।

মূল

নানা গাছের নানা রকম মূল দেখা যায়। কিন্তু তা হলেও সমস্ত রকমের মূলকে আমরা মোটামুটি দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি—(১) **স্বাভাবিক মূল** বা **স্থানিক মূল**; এবং (২) **অস্থানিক মূল** বা **নকল মূল**। যে সমস্ত মূল কাণ্ডের নীচে থেকে অর্থাৎ গাছের গোড়া থেকে বের হয়, তাদের বলা হয় স্বাভাবিক মূল। আর যে সমস্ত মূল গাছের অন্য কোন অংশ থেকে বের হয়, তাদের বলে অস্থানিক মূল। যেমন, বটের ঝুরি।

পেঁয়াজ—গুচ্ছ মূল

কেয়া গাছ—ঠেসমূল

স্বাভাবিক মূল—অধিকাংশ গাছেরই প্রধান মূল থাকে, এবং প্রধান মূল থেকে শাখা-প্রশাখার মত অসংখ্য মূল বের হয়। কিন্তু আবার কতকগুলি উদ্ভিদ আছে, যাদের প্রধান মূল বলে

কিছু নেই। যেমন ধান, আখ, পেঁয়াজ প্রভৃতি। এই সব গাছের গোড়া থেকে এক গোছা করে শিকড় বের হয়। তাই এই সব শিকড়ের নাম **গুচ্ছ মূল**। কচুরি পানা বা টোপা পানার শিকড় মাটিতে প্রবেশ করে না, জলের নীচে ভাসে। এই জাতীয় শিকড়কে বলে **জলজ মূল**।

অস্থানিক মূল—কেয়া গাছে মাটির কিছু উপরে কাণ্ডের গা থেকে অনেকগুলি শিকড় বেরিয়ে মাটিতে প্রবেশ করে; কেয়ার দুর্বল কাণ্ডকে ঠেস দিয়ে রাখে বলে এই শিকড়কে বলে

পাথরকুচির পাতা—পত্রজ মূল

গজপিপুল—আরোহী মূল

ঠেস মূল। বটের ঝুরিও একরকম ঠেস মূল। পাথরকুচির আবার পাতা থেকেও এক রকম শিকড় বেরোয়। তাকে বলে **পত্রজ মূল**। পান, গজপিপুল প্রভৃতি অন্য গাছকে আশ্রয় করে উপরে ওঠে। তাদের কাণ্ডের বিভিন্ন অংশ থেকে শিকড় বেরিয়ে আশ্রয়দাতা গাছের দেহে প্রবেশ করে। এই জাতীয় শিকড়কে বলে **আরোহী মূল**।

গাছের শিকড়ের গায়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম এক রকম রোঁয়া দেখা যায়। এর নাম **মূলরোম**। সমস্ত মূলের অগ্রভাগই অত্যন্ত নরম হয়। তাই মাটির ভেতর দিয়ে এগোবার সময় যাতে সে না ভেঙ্গে যায় তার জন্য মূলের অগ্রভাগ একরকম পুরু আবরণ দিয়ে ঢাকা থাকে। এর নাম **মূলত্রাণ**। কেতকী গাছের শিকড়ে এই মূলত্রাণ খুব স্পষ্ট দেখা যায়।

মূলের কাজ—মূলের সবচেয়ে বড় কাজ গাছকে খাদ্য সরবরাহ করা। শিকড় মাটি থেকে মূলরোমের সাহায্যে রস টেনে নিয়ে গাছের উপরে পাঠিয়ে দেয়। কোন কোন গাছের মূল আবার শুধু খাদ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করেই সন্তুষ্ট হয় না—ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করেও রাখে। শালগম, মুলো ও গাঁজর হল তারই উদাহরণ।
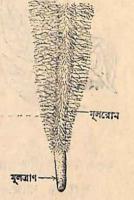
শিকড়ের দ্বিতীয় কাজ, মাটির উপর গাছকে খাড়া করে রাখা। শিকড় জোরে মাটি আঁকড়ে থাকে বলেই ঝড় বাতাসের ঝাপটে গাছ সহজে উপড়ে যায় না।

কাণ্ড

শিকড় নেমে যায় মাটির নীচের দিকে; আর গাছের যে অংশটি উপর দিকে বাড়তে থাকে, তাই পরে পরিণত হয় **কাণ্ডে**।

একটা চারা গাছ নিয়ে দেখ। তার কাণ্ডের যে জায়গা থেকে পাতা গজিয়েছে, তার নাম **গাঁট**, ভাল নাম **পর্বসন্ধি**। তুই

গাঁটের মাঝখানের অংশকে বলে **পর্বমধ্য**। পাতা ও গাঁটের মাঝখান থেকে অনেক সময় একটি করে মুকুল বেরোয়, তাকে বলা হয় **কক্ষ মুকুল**। এই কক্ষ মুকুল থেকেই পরে শাখা বা ডালের জন্ম হয়। আর কাণ্ডের একেবারে মাথায়ও একটি মুকুল থাকে, তার নাম **শির মুকুল** বা **অগ্র মুকুল**। অগ্র-মুকুল যত বাড়তে থাকে, ততই বাড়তে থাকে কাণ্ড।
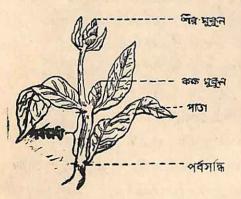
কাণ্ডের কাজ—রাশি রাশি সবুজ পাতা, ডালপালা, ফুল-ফল, সব সমেত গাছকে মাটির উপর কাণ্ডই দাঁড় করিয়ে রাখে। শিকড় যে খাদ্যরস মাটি থেকে উপরে পাঠিয়ে দেয়, কাণ্ডই তাদের পাঠিয়ে দেয় পাতা ও ডালপালার মধ্যে।

এসব ছাড়াও কোন কোন কাণ্ড জীবজন্তুর হাত থেকে গাছকে বাঁচানোর জন্য বহুরূপী হয়; যেমন—ময়না কাটা। কোন কোন কাণ্ড হয় পাতার মত চ্যাপ্টা ও সবুজ রঙের; যেমন ফণিমনসা। এরা পাতার মতই গাছের খাদ্য তৈরি করে। কোন কোন কাণ্ড আবার মাটির তলায় থাকে; যেমন—আলু, কচু, আদা, হলুদ প্রভৃতি। এরা গাছের জন্য খাদ্য মজুত রাখে।

পাতা

পাতার মোটামুটি তিনটি অংশ—**পত্রমূল, বৃন্ত ও ফলক**। যেখানে কাণ্ড বা শাখার সঙ্গে পাতার যোগ হয়েছে, সেই অংশের নাম **পত্রমূল**। পত্রমূল থেকে বেরিয়েছে **বৃন্ত** বা **বোঁটা**। বৃন্তের পরের অংশকে বলে **ফলক**। সাধারণতঃ এই ফলকটিকেই আমরা পাতা বলি।

নানা গাছের পাতা নানা রকম। পার্থক্য দেখ আম পাতা আর তেঁতুল পাতার মধ্যে। গাঁট থেকে আম পাতা বেরিয়েছে মাত্র একটি। আর তেঁতুল পাতার বেলায় দেখ, আগে একটি ডাঁটার মত বেরিয়েছে, আর তার ছ'পাশে রয়েছে জোড়া জোড়া পাতার সারি। আম পাতার মত যেসব পাতায় ফলক একটি, তাদের বলে **সরল** বা **মৌলিক** পাতা, আর তেঁতুল পাতার মত যেসব পাতায় ফলক থাকে একাধিক, তাদের বলে **যৌগিক** পাতা।

১। আম পাতা
২। তেঁতুল পাতা

পাতার কাজ—তোমরা জান, মূল মাটি থেকে রস সংগ্রহ করে কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখার সাহায্যে পাতায় পৌঁছে দেয়। আমাদের যেমন শুধু খাদ্য সংগ্রহ করলেই চলে না, রান্না করে তাকে খাওয়ার উপযুক্ত করে নিতে হয়, গাছের বেলায়ও তাই। বলতে গেলে পাতাই হচ্ছে গাছের রান্নাঘর।

গাছের পাতার রঙ সবুজ কেন, জান? পাতায় ক্লোরোফিল বা **পত্রহরিৎ** বলে একটি বস্তু আছে, তারই জন্যে পাতার রঙ হয় সবুজ। এই পত্রহরিৎ সূর্যের আলো পেলে খাদ্যরসকে গাছের উপযোগী খাদ্যে রূপান্তরিত করে। কিভাবে করে, তাই এবার শোনো।

অঙ্গারাত্মকরণ—বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নামে একরকম গ্যাস আছে। কার্বন বা অঙ্গার এবং অক্সিজেনের মিলনে এই গ্যাস তৈরী হয়। গাছের পাতায় সূর্যের আলো পড়লে পত্রহরিৎ বাতাস থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং গাছের উপযোগী খাদ্য তৈরি করবার জন্য শুধু কার্বন বা অঙ্গারটুকু শোষণ করে নিয়ে অক্সিজেনটুকু আবার বাতাসে ফিরিয়ে দেয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় অঙ্গারাত্মকরণ। উদ্ভিদ যদি এই ভাবে অঙ্গার শোষণ না করত, তা হলে অল্পকালের মধ্যে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ এত বেড়ে যেত যে, প্রাণীর পক্ষে জীবনধারণ করা অসম্ভব হ'ত। মনে রেখ, যতক্ষণ সূর্যের আলো থাকে, ততক্ষণই এই প্রক্রিয়া চলে।
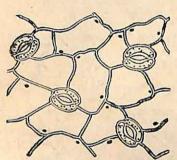
পাতার ছিদ্র বা স্টোমা।
(অনেক বড় করে
দেখান হয়েছে)

শ্বাস-প্রশ্বাস—অন্যান্য জীবের মত গাছপালাও প্রশ্বাস নেয় ও নিশ্বাস ত্যাগ করে; গাছের পাতাই প্রধানতঃ

শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালায়। গাছের শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ কিন্তু আমাদের মত দিনরাত সব সময়ই চলতে থাকে।

প্রস্বেদন—মূলের সাহায্যে মাটি থেকে গাছ যখন রস টেনে নেয়, তখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত জলও সেই সঙ্গে আসে এই অপ্রয়োজনীয় জল পাতার খুব ছোট ছোট ছিদ্র দিয়ে বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। একেই বলা হয় প্রস্বেদন। ছিদ্রগুলি এত ছোট যে, খালি চোখে তাদের দেখা যায় না এদের বলা হয় 'স্টোমা'।

ফুল

গাছে গাছে রঙ-বেরঙের কত ফুল ফোটে। ফুলের রূপ ও গন্ধ সবার মন মাতায়, ফুল আমাদের মুগ্ধ করে।

ফুলের কাজ—কিন্তু ফুলের কাজ শুধু আমাদের মুগ্ধ করা নয়। তার কাজ আরও অনেক বড়। ফুল না থাকলে পৃথিবীতে নতুন গাছ জন্মাত না। ফুল থেকে ফল, ফল থেকে বীজ এবং বীজ থেকে নতুন গাছের চারা— এমনি ভাবেই ঘুরে ফিরে চলেছে উদ্ভিদজগতের বংশরক্ষা ও বংশবৃদ্ধি। তাই সাধারণভাবে বলা যায়—ফুলের সবচেয়ে বড় কাজ গাছের বংশরক্ষা ও বংশবৃদ্ধি। অবশ্য এমন ফুলও আছে, যারা গাছের বংশরক্ষা বা বংশবৃদ্ধিতে কোন সাহায্যই করে না।

ফুলের বিভিন্ন অংশ

ধুতুরা ফুল—বোঁটাসমেত একটা ধুতুরা ফুল নিয়ে এস। প্রথমেই দেখ, বোঁটার উপর সবুজ রঙের একটা চোঙা। এর নাম **বৃতি**। বৃতির উপরের অংশে দেখবে পাঁচটি ভাগ। এদের বলে **বৃত্যংশ** (বৃতি+অংশ)। ফুল যখন কুঁড়ি অবস্থায় থাকে, তখন এই বৃতিই তাকে ঢেকে রাখে, বাঁচিয়ে রাখে। বৃতির মধ্যে বসান আছে বড় চোঙার মত সাদা রঙের আরও একটা জিনিস। এইটাই আসল ফুল। মুখের দিকটা তার প্রায় ফানেলের মত ছড়ান। ফুলের এই অংশটির নাম **দল**। দলে দেখ পাঁচটা ভাঁজ রয়েছে। প্রত্যেক ভাঁজের নাম **পাপড়ি**। ধুতুরা ফুলের পাপড়িগুলি পরস্পর জোড়া বলে তাকে বলা হয় **যুক্তদল**।

ভিতরের দিকে প্রত্যেক পাপড়ির গায়ে সুতোর মত একটা করে সরু লম্বা ডাঁটা আছে, আর তাদের মাথায় আছে একটা করে খুব ছোট গুটি। গুটি সমেত ঐ ডাঁটা বা নলকে বলে **পুংকেশর** বা **পরাগকেশর**। শুধু নলটুকুর নাম **পুংদণ্ড**।

মাথার গুটির নাম **পরাগকোষ** বা **রেণুকোষ**। পরাগকোষের মধ্যে হলদে রঙের খুব মিহি একরকম গুঁড়ো থাকে। এইগুলিই ফুলের **রেণু** বা **পরাগ**।

ফুলটির ঠিক মাঝখানে সুতোর মত আর একটা সরু ফাঁপা লম্বা নল আছে। তার নাম **গর্ভকেশর**। এর মাথায়ও ছোট্ট একটা গুটি আছে। তাকে বলে **গর্ভমুণ্ড**। গর্ভমুণ্ডের পরে নীচের অংশের নাম **গর্ভদণ্ড**। গর্ভদণ্ডের একেবারে নীচের অংশটা অপেক্ষাকৃত মোটা ও ফাঁপা। তার নাম **গর্ভকোষ**। গর্ভকোষের মধ্যে জন্মে **বীজ**।

ধুতুরা ফুলের তাহলে চারটি অংশ—বৃতি, দল, পুংকেশর ও গর্ভকেশর। যেসব ফুলের চারটি অংশই আছে, তাদের বলা হয় **সম্পূর্ণ ফুল**। আর যেসব ফুলে এই চারটি অংশের কম থাকে, তাদের বলা হয় **অসম্পূর্ণ ফুল**। জবা, পদ্ম, অপরাজিতা প্রভৃতি সম্পূর্ণ ফুল। লাউ, কুমড়া, প্রভৃতি অসম্পূর্ণ ফুল।

সব ফুলেই কিন্তু পুংকেশর আর গর্ভকেশর একসঙ্গে থাকে না। যে সব ফুলে একসঙ্গে থাকে, তাদের বলা হয় **উভলিঙ্গ** ফুল। ধুতুরা, জবা প্রভৃতি এই জাতের। আর যেসব ফুলে হয় গর্ভকেশর, নয় পুংকেশর থাকে, তাদের বলা হয় **একলিঙ্গ** ফুল। পুংকেশর থাকলে ফুলটিকে বলে **পুরুষ ফুল**, আর গর্ভকেশর থাকলে ফুলটিকে বলে **স্ত্রী ফুল**। লাউ, কুমড়া প্রভৃতির বেলায় একই গাছে পুরুষ ফুল ও স্ত্রী ফুল, দু'-ই ফোটে। কিন্তু তাল, পঁপে প্রভৃতি গাছের কোনটিতে শুধু পুরুষ ফুল, কোনটিতে বা শুধু স্ত্রী ফুল ফোটে।

জবাফুল—জবাফুলের বৃতি, দল, পুংকেশর ও গর্ভকেশর—চারটি অংশই আছে। জবাফুল তাই **সম্পূর্ণ** ও **উভলিঙ্গ**। তার বৃন্তও রয়েছে, তাই সে **সবৃন্তক**। জবার বোঁটাটি বেশ লম্বা, বোঁটার উপরে রয়েছে বৃতি; বৃতিটি পাঁচটি বৃত্যংশে বিভক্ত। জবার আরও একটি বিশেষত্ব আছে—তার বৃতির নীচেই রয়েছে সবুজ রঙের কয়েকটি ছোট **উপবৃতি**; বৃতির উপরে আছে পাঁচটি সমান আকারের লাল পাপড়ি, কিন্তু ধুতুরা ফুলের মত সেগুলি জোড়া নয়। জবাফুলকে তাই বলা হয় **মুক্তদল**।

জবাফুল খণ্ডিত জবাফুল
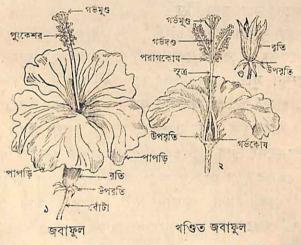
এবার ফুলটির বৃতি ও পাপড়িগুলি সাবধানে ছিঁড়ে ফেল। থাকবে শুধু লাল রঙের একটা লম্বা ডাঁটা বা নল। নলটিকে এক কথায় বলা হয় **পুংকেশর-নল**। নলের মাথায় এবং পাশে সরু সুতোর মত অনেকগুলি জিনিস দেখতে পাবে। সুতোগুলির মাথায় দেখবে ছোট্ট ছোট্ট গুটি। পাশের

সুতোগুলির গুটিতে পরাগ থাকে। ঐগুলিই জবার **পরাগকোষ**। পরাগকোষ ও সুতোকে একসঙ্গে বলে **পুংকেশর**। সুতরাং জবার পুংকেশর অনেকগুলি।

কিন্তু জবার কি গর্ভকেশর নেই ? আছে। ধুতুরা ফুলের মত তা পৃথক ভাবে নেই, পুংকেশর-নল তাকে ঢেকে রেখেছে। খুব সাবধানে এই নলটি ছিঁড়ে ফেল, তার মধ্যে আর একটি সাদা ডাঁটা দেখতে পাবে। পুংকেশর-নলের মাথায় গুটিসমেত যে পাঁচটি সুতো আছে, সেগুলি দেখবে এই ডাঁটার সঙ্গে যুক্ত। ঐগুলিই জবার **গর্ভমুণ্ড**। ডাঁটা ও গর্ভমুণ্ডগুলিকে একত্রে বলা হয় **গর্ভকেশর**। ডাঁটাটি ফাঁপা। তার নাম **গর্ভদণ্ড**। গর্ভদণ্ডের গোড়া অর্থাৎ গর্ভকেশরের সবচেয়ে নীচের অংশ কিছু মোটা। ঐটাই **গর্ভকোষ**। গর্ভকোষটি চিরে ফেললে **ডিম্বকোষ** দেখতে পাবে।

অপরাজিতা ফুল

অপরাজিতা ফুল—অপরাজিতাও একটি সম্পূর্ণ, উভলিঙ্গ, সবৃন্তক ফুল। কিন্তু তার বোঁটাটি জবার বোঁটার মত অত লম্বা নয়। পাঁচ-পাঁচটি সবুজ রঙের বৃত্যংশ পরস্পর জুড়ে তৈরী হয়েছে তার বৃতি। অপরাজিতার পাপড়ি পাঁচটি। তাদের মধ্যে একটি খুব বড়, অন্যগুলি খুব ছোট। কুঁড়ি
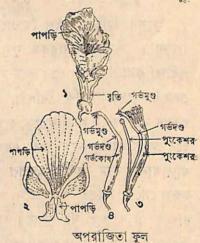
অবস্থায় পাখ্‌নার মত এই বড় পাপড়িটি আর সবগুলিকে ঢেকে রাখে। সবচেয়ে ভেতরে যে পাপড়ি দুটি আছে, তারা নীচের দিকে জুড়ে গিয়ে দেখতে হয় নৌকার মত।

অপরাজিতার পুংকেশর দশটি। তাদের মধ্যে একটি আলাদা, বাকি নয়টি যুক্ত। এই নয়টি পুংকেশর এক সঙ্গে মিশে গর্ভকেশরকে ঢেকে রেখেছে। গর্ভকেশর মাত্র একটি। গর্ভদণ্ডের নীচের অংশ—গর্ভকোষ ; দেখতে লম্বা ও মোটা। গর্ভকোষের মধ্যে আছে ডিম্বকোষ। গর্ভদণ্ডটি আগার দিকে ক্রমশঃ সরু হয়ে পরিণত হয়েছে গর্ভমুণ্ডে।

ফুল সংগ্রহ ও ফুলের সংগ্রহ-পুস্তক

ফুলের বিভিন্ন অংশ কিভাবে পরীক্ষা করতে হয়, তোমরা জেনেছ। আরো নানারকম ফুল নিয়ে এইভাবে তোমাদের পরীক্ষা করতে হবে। শুধু তাই নয় ; কোন্ ঋতুতে কি কি ফুল ফোটে, তাদের কি কি বৈশিষ্ট্য, সে-সব সম্পর্কেও তোমাদের যতদূর সম্ভব জ্ঞান লাভ করতে হবে। সেজন্য প্রথমেই দরকার হবে মোটা কাগজ দিয়ে তৈরী একখানা খাতা। মলাটের উপর খাতাখানার নাম লিখবে **ফুলের সংগ্রহ-পুস্তক**। বাগান বা জঙ্গল থেকে বিভিন্ন ফুল এনে পরীক্ষা করবে, তারপর এঁটে রাখবে ঐ খাতার বাঁ পৃষ্ঠায়। ডান পৃষ্ঠায় লিখবে ফুলটির বিবরণ ; যেমন, তার সংগ্রহের তারিখ ও স্থান, নাম, রঙ, গন্ধ, কোন্ কোন্ মাসে ফোটে, গঠন ও আকৃতি, কোন্ জাতীয় ফুল—সম্পূর্ণ, না অসম্পূর্ণ, ইত্যাদি।

এখন প্রশ্ন হল, খাতার পাতায় ফুল আঁটবে কিভাবে? একটা ফুল এনে প্রথমে তাকে পরিষ্কার করে দুটি ব্লটিং কাগজের মধ্যে রাখবে এবং তার উপর ভারী কোন একটা জিনিস চাপা দেবে। কিছুকাল পরে দেখবে, ফুলের জলীয় অংশ ব্লটিং কাগজে শুষে নিয়েছে। শুক্‌না ফুলটা তখন খাতার বাঁ দিকের পাতায় আঠা দিয়ে এঁটে দেবে। আঠার সঙ্গে তুঁতে-জাতীয় কিছু মিশিয়ে দিলে পোকায় ফুল নষ্ট করতে পারবে না। কাগজ থেকে ফুলটা হয়ত কোন সময় পড়ে যেতে পারে। সেজন্য কাগজের কতকগুলি সরু সরু ছোট টুক্‌রো আঠা দিয়ে এঁটে দিতে পার ফুলটার গায়ে।

পরাগমিলন

আমরা আগেই জেনেছি, পরাগকোষে পরাগ বা রেণু থাকে। পরাগকোষ যখন বেশ পরিপুষ্ট হয়, তখন আপনা-আপনিই তা ফেটে যায় এবং পরাগ বেরিয়ে আসে। মধুর লোভে কিংবা রঙে বা গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে মৌমাছি, প্রজাপতি প্রভৃতি পতঙ্গ এসে ফুলের উপর বসে, তখন তাদের গায়ে পায়ে এই পরাগ লেগে যায়। তারপর তাদের গা থেকে সেই পরাগ

গিয়ে পৌঁছায় ফুলের গর্ভমুণ্ডে। পরাগ আর গর্ভমুণ্ডের এই মিলনকে বলে **পরাগমিলন**। এরই থেকে গর্ভকোষে ভবিষ্যতে ফলের জন্ম হয়। ফলের ভিতরে থাকে বীজ। সেই বীজ থেকে আবার গাছের জন্ম হয়। কিন্তু মনে রাখবে, একই জাতের ফুলে না পড়ে পরাগ যদি অন্য জাতের ফুলের গর্ভমুণ্ডে পড়ে, তাহলে কিছুতেই পরাগমিলন হবে না, সুতরাং তাতে ফলও হবে না।

যে সব ফুলের রং অথবা গন্ধ আছে, তাদের পরাগমিলন ঘটে **কীট-পতঙ্গের** সাহায্যে। কিন্তু যে সব ফুলের তা নেই, তাদের পরাগ **বাতাসে** ভেসে গিয়ে গর্ভমুণ্ডের সঙ্গে মেশে। ধান, গম, যব প্রভৃতি গাছে এই ভাবেই পরাগমিলন হয়। পাটা-শেওলা জাতীয় জলজ গাছের পরাগমিলন সাধারণতঃ **জলের** সাহায্যে হয়। **পাখি** আবার অনেক গাছের পরাগমিলন ঘটিয়ে দেয়। শিমূল গাছে যখন টক্‌টকে লাল ফুল ফোটে, পাখি তখন সেই ফুল ঠোকরায়, আর তার ফলে পরাগমিলন হয়।

গাছ ও গাছের শাখা-বিন্যাস

চারপাশে যেসব গাছপালা আমরা সব সময় দেখছি, তাদের ডালপালাগুলি একটু ভালভাবে পরীক্ষা করলেই দেখবে, শাখা বা ডালের জন্ম এলোমেলো ভাবে হয় না কখনও। তারও একটা নিয়ম আছে। দেখবে, সব গাছেই শাখা বা ডালের অবস্থান একই ধরনের হয় না, ভিন্ন ভিন্ন গাছের গায়ে শাখা বা ডাল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাজান থাকে। বিচিত্র তাদের এই **শাখা-বিন্যাস**। সাধারণতঃ দেখা যায়, গাছের

প্রধান বা আসল কাণ্ডটি কিছু দূর বাড়বার পরই মাথার মুকুলটি দু'ভাগ হয়ে যায়। সেখান থেকে সমান ধরনের দুটি শাখা বের হয়। তারপরে সেই দুটি শাখা থেকে আবার চারটি শাখা বের হয়। এই ভাবেই বাড়তে থাকে ডালপালার সংখ্যা।

দেবদারু জাতীয় এক ধরনের গাছ আছে, যাদের প্রধান বা আসল কাণ্ডটিই সাধারণতঃ কেবল বাড়ে এবং লম্বা ও মোটা হয়; আর কাণ্ডের দু'পাশে নীচের দিকে বেরোতে থাকে অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট ডালপালা।

করবী গাছের আসল কাণ্ড কিছু দূর অবধি বাড়বার পরই তার বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। তখন শাখারা বাড়তে থাকে। তারপর তাদের বৃদ্ধিও বন্ধ হয়। তখন প্রশাখারা বাড়তে থাকে। এসব ক্ষেত্রে অনেক সময়ই শাখা-প্রশাখা আসল কাণ্ড থেকে বেশী বেড়ে যায়। অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি গাছের আসল কাণ্ড ও শাখা এমন বাড়ে যে, শেষ পর্যন্ত কোন্‌টা আসল কাণ্ড এবং কোন্‌গুলিই বা তার শাখা, তা বুঝা কষ্টকর হয়।

শাখা-বিন্যাসে এসব পার্থক্য সত্ত্বেও একটা ব্যাপারে কিন্তু সব গাছের মধ্যেই খুব বড় একটা মিল আছে। সূর্যকিরণ যাতে সমান ভাবে গাছের সব অংশে ঠিক মত পৌঁছিতে পারে, তেমনিই ভাবেই শাখাগুলি গাছের গায়ে সাজান থাকে।

ছোট শাখার পর্যবেক্ষণ

একটা ছোট ডাল ভেঙ্গে নিয়ে পরীক্ষা কর। দেখবে, তার মাথায় একটি মুকুল। এটির নাম **অগ্রমুকুল** বা

শিরমুকুল। এই মুকুলটি ভেঙ্গে গেলে ডাল আর বাড়তে পারে না। বিভিন্ন গাছের ডাল নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখবে, সব গাছে একই নিয়মে পাতা জন্মায় না। কোন গাছে প্রত্যেক গাঁটে একটি করে পাতা বের হয়, কোনো গাছে আবার প্রত্যেক গাঁটে পাতা বের হয় দুটি করে।

গাছের ছাল ও শাখামুকুলের পরীক্ষা

গাছের ছাল—মানুষের গায়ে যেমন চামড়া বা ত্বক আছে, গাছেরও তেমনি আছে ছাল বা ত্বক। ছালের গায়ে লোমকূপের মত অসংখ্য ছিদ্র আছে। এইসব ছিদ্রের ভিতর দিয়ে বাতাস গাছের কাণ্ডে ঢোকে। গাছের ছাল প্রথম অবস্থায় প্রায়ই সবুজ থাকে। তখন পাতার মত ছাল দিয়েও খাদ্য তৈরির কাজ কিছুটা চলে। গাছ বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছালেরও পরিবর্তন হয়। সব গাছের ছালই আবার একরকম নয়। কোন ছাল পুরু, কোন ছাল পাতলা, কোন ছাল আবার আঁশ-আঁশ।

গাছের ছালের প্রধান উদ্দেশ্য হল, গাছকে শীত, গ্রীষ্ম, বৃষ্টি ও জীবাণু প্রভৃতি শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করা। গাছের ছাল থেকে নানারকম ওষুধ এবং প্রয়োজনীয় বহু জিনিস তৈরী হয়।

শাখামুকুল—তোমরা জান, কাণ্ডের গায়ে থাকে কক্ষমুকুল। এই কক্ষমুকুলই বেড়ে শাখায় পরিণত হয়। তাই কক্ষমুকুলকে শাখামুকুলও বলা যায়। পরীক্ষা করলে দেখবে, এই মুকুলগুলি যেন এক একটি বড় ডালের আশ্চর্য ছোট সংস্করণ। এর ভিতরে ছোট ছোট গাঁট, পাতা, পাব, সবই আছে। পরে এ থেকে ডাল জন্মালে ডালের দেহে এই চিহ্নগুলি পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে।

জলের মধ্যে গাছের ডালের পরিবর্তন

পাতা ও ফুলের কুঁড়িসমেত রজনীগন্ধার একখানা ডাল যোগাড় কর। তারপর ডালের গোড়াটাকে জল-ভরা একটা বোতলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখ। বোতলের সবটাই জলে ভর্তি কোর না এবং জলে একটু নুন মিশিয়ে দিও। দেখবে, দিন কয়েক ডালটি বেশ সতেজ থাকবে এবং ফুলগুলিও ফুটে উঠবে। ডাল আর পাতার মধ্যে যেটুকু খাদ্য আছে, তা দিয়েই ডালটি জীবন ধারণ করবে কয়েক দিন। কিন্তু নতুন খাবার না পাওয়ায়, ঐ সঞ্চিত খাদ্য ফুরোতেই ডালটি শুকিয়ে মরে যাবে, ঝরে পড়বে ফুল ও পাতাগুলি।

পাতাবাহারের ডাল

কিন্তু পাতাবাহারের ডাল এই ভাবে জলে ডুবিয়ে রাখলে দেখবে, জলের মধ্যে তার গোড়ার দিকে ছোট ছোট শিকড় বের হবে। ডালটিকে তখন মাটিতে পুঁতে দিলে ডালটি বেঁচে যাবে।

অনুশীলনী

১। গাছের মূল, কাণ্ড, পাতা ও ছালের কাজ কি ?
২। গাছের অঙ্গারাত্মকরণ ও প্রস্বেদন কাকে বলে ?
৩। গাছের শাখা-বিন্যাস সম্বন্ধে কি জান ?
৪। ধুতুরা, জবা ও অপরাজিতা ফুলের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও।
৫। ফুলের কাজ কি ? পরাগমিলন কাকে বলে এবং কি কি ভাবে ফুলের পরাগমিলন ঘটে ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফসল কাটার পদ্ধতি ঃ তার সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

চাষ-আবাদের ফলে জমি থেকে যে জিনিস আমরা পাই, তাকে সাধারণতঃ **শস্য** বা **ফসল** বলা হয়। জমি থেকে বিভিন্ন রকম ফসল কাটবার ভিন্ন ভিন্ন রকম পদ্ধতি রয়েছে। কোন কোন ফসল কাটা হয় কাস্তে দিয়ে; যেমন—ধান, পাট, ইত্যাদি। কোন কোন ফসলের গাছ আবার গোড়া সমেত তুলে আনা হয়; যেমন—ডাল-কলাই, সরিষা, ইত্যাদি। কোন কোন ফসল আবার কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে তোলা হয়; যেমন—গোল আলু, চীনাবাদাম, ওল, কচু, ইত্যাদি।

ধান—ধান ঠিকমত পাকতেই চাষীরা কাস্তে নিয়ে দলে দলে মাঠে নামে। ধান কাটা শুরু হয়। মাটির একটু উপরে গোড়া থেকে ধানগাছ কাস্তে দিয়ে কেটে গোছা করে পাশে রাখা হয়। পরে আঁটি বেঁধে ক্ষেত থেকে মাথায় করে অথবা গরু বা মোষের গাড়িতে করে খামারে বা বাড়িতে

ধান কাটা

এনে গাদা করে কয়েক দিন রাখা হয়। তারপর বিশেষ ভাবে তৈরী পাটায় বা তক্তায় ধানের গোছাগুলি আছড়ে গাছ থেকে ফসল আলাদা করে ফেলা হয়।

এখানেই কিন্তু শেষ নয়। ধানে পোকা লাগে, ধান পচে যায়, ইঁদুরে ধান নষ্ট করে—ধান নষ্ট হয় নানা ভাবে। সুতরাং পরবর্তী সমস্যা হল, এত মেহনতের ফসল ঠিকমত সংরক্ষণ করা।

আমাদের দেশে চাষীরা সাধারণতঃ ধান ভালভাবে রোদে শুকিয়ে মরাইতে বা গোলাঘরে তুলে রাখে। এ সব সত্ত্বেও কিছু ফসল নষ্ট হয়। সেজন্য বর্তমানে কোন কোন জায়গায় আধুনিক ধরনের গুদাম তৈরি করে ধান রাখা হয়। সেখানে ঠিকমত আলো-বাতাস যেমন যেতে পারে, ফসলেও তেমনি পোকা লাগে না এবং ঝড়-জল-বৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হয় না।

ধানের মরাই

পাট—পাটগাছে ফুল থেকে ফল ধরতে আরম্ভ করলেই বুঝতে হবে পাট কাটার সময় হয়েছে। চাষীরা ধারাল কাস্তে দিয়ে মাটির উপর থেকেই পাট গাছ কাটে এবং ২।৩ দিন জমিতে ফেলে রাখে। তারপর আঁটি বেঁধে জলে জাগ দেওয়া হয়। জাগ দেবার সময় আঁটিগুলি একটার পর একটা সাজিয়ে সবার উপরে কোন ভারী জিনিস চাপা দেওয়া হয়, যাতে পাটগাছগুলি সবই জলের মধ্যে সম্পূর্ণ ডুবে থাকে। একে বলে 'পাট পচানো'।

পাটের গোছা

কিছুদিনের মধ্যেই পাট পচে গিয়ে ছাল যখন নরম হয়, তখন ডাঁটা থেকে ছাল আলাদা করে ফেলা হয়। ছাল থেকে আঁশ বেরিয়ে পড়ে। তখন আঁশগুলি গোছা বেঁধে ভালভাবে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। অযত্ন বা অসাবধানতার জন্য অনেক সময় পোকা লেগে বা জলে পচে পাট নষ্ট হয়। সেজন্য ধানের গুদামের মত পাটের গুদামও আধুনিক উপায়ে তৈরী হওয়া উচিত।

যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ফসল কাটা—পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে ফসল বোনা ও কাটার পদ্ধতি আমাদের দেশ থেকে স্বতন্ত্র। সেখানে ট্রাক্টর জাতীয় যন্ত্র দিয়ে সাধারণতঃ জমি চাষ করা ও বীজ বোনা হয়, এবং হারভেস্টর কম্বাইন নামক যন্ত্র দিয়ে ফসল কাটা হয়। এই সব যন্ত্র ব্যবহারের ফলে জমিতে ফসলের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ে, খরচ কমে এবং পরিশ্রমের লাঘব হয় যথেষ্ট। তাছাড়া অল্প সময়ে অনেক বেশী পরিমাণে জমি চাষ করা ও ফসল কাটা যায়। আমাদের দেশের চাষীরা খুব গরীব, যন্ত্রশিল্পেও আমাদের দেশ যথেষ্ট পশ্চাৎপদ; তার উপর আমাদের চাষের জমিগুলিও ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত। এইসব কারণে ট্রাক্টর বা হারভেস্টর কম্বাইনের প্রচলন আমাদের দেশে বিশেষ হয়নি।

অনুশীলনী

১। আমাদের দেশে কোন্ কোন্ ফসল সাধারণতঃ কি কি ভাবে কাটা হয়?

২। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ফসল কাটার সুবিধা কি?

তৃতীয় অধ্যায়

কয়েকটি প্রাণীর জীবন-কথা

অসংখ্য প্রাণীর বাস এই পৃথিবীতে। তাদের মধ্যে চোখে দেখা যায় না এমনি অতি ছোট ছোট জীব থেকে শুরু করে বিরাট বিরাট দৈত্যের মত জীবও রয়েছে। বিজ্ঞানীরা কিন্তু এই সুবিশাল প্রাণী-জগৎকে মাত্র দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন—মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী। যে সমস্ত প্রাণীর মেরুদণ্ড আছে, তাদের বলা হল, **মেরুদণ্ডী প্রাণী** ; যেমন—মানুষ, গরু, কুকুর, বিড়াল, সাপ, ব্যাঙ প্রভৃতি। যে সব প্রাণীর মেরুদণ্ড নেই, তাদের বলা হয় **অমেরুদণ্ডী প্রাণী** ; যেমন,—মশা, মাছি, পিঁপড়ে, মৌমাছি, প্রজাপতি প্রভৃতি।

পতঙ্গ

যে সব প্রাণীর মেরুদণ্ড নেই, তাদের মধ্যে মশা, মাছি, মৌমাছি, প্রজাপতি, পঙ্গপাল প্রভৃতিকে বলা হয় **পতঙ্গ**। স্বভাব ও চেহারায় যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও, দেহের গঠনে সব পতঙ্গের মধ্যেই মোটামুটি একটা সাদৃশ্য আছে।

সমস্ত পতঙ্গের শরীরেই মাথা, বুক আর পেট—এই তিনটি অংশ আছে। মাথায় আছে একজোড়া শুঁড় আর এক জোড়া চোখ। চোখজোড়া কিন্তু অদ্ভুত ধরনের। প্রত্যেক চোখের মধ্যেই আছে অসংখ্য ছোট ছোট চোখ। তাই এই চোখের নাম পুঞ্জাক্ষি। পুঞ্জাক্ষি থাকায় তারা সহজেই

পিছনে ও চারপাশে দেখতে পারে। পতঙ্গদের বুকে সাধারণতঃ তিনটি ভাগ আছে। প্রতিটি ভাগ থেকে বেরিয়েছে একজোড়া করে পা। অনেক পতঙ্গের পিঠের উপর ডানা আছে—কারুর একজোড়া, কারুর বা হু'জোড়া। অনেকের আবার ডানা থাকে না। পতঙ্গ শুঁড় দিয়ে সামনের ও কাছের জিনিসের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে।

প্রজাপতি

প্রজাপতি একজাতীয় পতঙ্গ। ফুলে ফুলে তারা মধু খায়; ফুলের মতই তারা অপূর্ব সুন্দর। নানাবর্ণশোভিত বিচিত্র সুন্দর তাদের ডানাগুলি।

প্রজাপতির মতই আর একজাতীয় পতঙ্গ আছে, তাদের বলা হয় **মথ**। মথকে রাত **প্রজাপতিও** বলে। প্রজাপতি ও মথের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য আছে। প্রধান পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে, যখন তারা কোন কিছুর উপরে বসে। প্রজাপতি বসবার সময় ডানাগুলি পরস্পরের সঙ্গে লাগিয়ে নৌকোর পালের মত সোজা খাড়া করে রাখে। আর মথ বসবার সময় ডানাগুলি হু'পাশে সম্পূর্ণ ছড়িয়ে মেলে দেয়। প্রজাপতির শুঁড় হুটির গোড়া ও আগার দিকটা মোটা। কিন্তু মথের শুঁড় হুটির গোড়া ও আগার দিকটা সরু।

অনুভব করার জন্য মাথার শুঁড় হুটি ছাড়াও প্রজাপতি ও মথের মুখে মধু খাওয়ার জন্য আর একটি লম্বা শুঁড় আছে। এই শুঁড়ের সাহায্যেই তারা ফুলের ভিতর থেকে মধু পান করে।

প্রজাপতির শুঁড়টি সাধারণতঃ স্প্রিং-এর মত গুটান থাকে, কিন্তু ফুল থেকে মধু পান করবার আগেই তা পাক খুলে সোজা হয়ে যায়। মথ ও প্রজাপতির দেহের অন্যান্য অংশের গঠন সাধারণ পতঙ্গের মতই। তাদের ডানা আছে দু' জোড়া।

জন্মকথা—জন্ম থেকে পরিণত অবস্থায় পৌঁছান পর্যন্ত প্রজাপতি ও মথের জীবনে চার রকম রূপান্তর ঘটে। সমস্ত পতঙ্গের জীবনেই সাধাধণতঃ এই চারটি পর্যায় আসে।

প্রজাপতি মথ
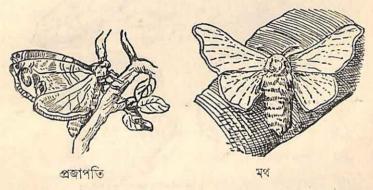
স্ত্রী-প্রজাপতি ও স্ত্রী-মথ প্রথমে গাছের পাতায় সাদা সাদা পোস্তদানার মত ডিম পাড়ে। কিছুদিনের মধ্যেই ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়। তাদের বলা হয় শূক বা লার্ভা। প্রজাপতির লার্ভার গায়ে শুঁয়ো থাকে, তাই তাদের শুঁয়োপোকাও বলে। কিন্তু মথের লার্ভার গায়ে শুঁয়ো থাকে না। শূকগুলি হয় মারাত্মক রকমের পেটুক। ডিম থেকে বেরিয়েই তারা ডিমের খোলস, গাছের পাতা প্রভৃতি খেতে শুরু করে। এই সময়ে তারা কয়েকবার খোলস বদলায়। কিছু দিন পরেই খেয়েদেয়ে

বেশ মোটাসোটা হলে তারা খাওয়া বন্ধ করে এবং নির্জন একটা জায়গা বেছে নিয়ে নিজেদের শরীরের চারপাশে মুখের লালা দিয়ে বর্মের মত একটা গুটি তৈরি করে। তারপর গুটির মধ্যে তারা না খেয়েদেয়ে পড়ে থাকে মড়ার মত। তাদের এই অবস্থার নাম পিউপা। মথের পিউপাকে পলু বা গুটিপোকাও
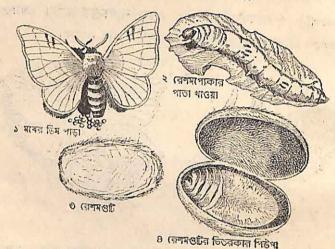
বলে। এই সময় তাদের দেহে পরিবর্তন হয় প্রচুর। তারপর সময় হলে গুটিটা একদিন ফেটে যায় এবং গুটির ভিতরকার কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে আসে সুন্দর পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি বা মথ।

গুটিপোকা

কয়েক জাতীয় মথের গুটি থেকেই রেশম, এণ্ডি, মুগা প্রভৃতি সুতো পাওয়া যায়। যাঁরা রেশমের চাষ করেন, অর্থাৎ রেশমের জন্য যাঁরা মথ পোষেন, তাঁরা গুটি থেকে পূর্ণাঙ্গ মথ

বেরুবার ঠিক আগেই গুটিগুলি গরম জলে ফেলে পলুগুলি মেরে ফেলেন। তার ফলে গুটি ফেটে গিয়ে রেশম নষ্ট হওয়ার যেমন কোনো সম্ভাবনা থাকে না, তেমনি গরম জলে গুটি বেশ নরম হওয়ায় সুতো বের করাও অনেক সহজ হয়। যে সব পলু বা গুটিপোকা থেকে রেশম, এণ্ডি, মুগা প্রভৃতি তৈরী হয়, তাদের সব আলাদা আলাদা নাম আছে; যেমন—রেশম পলু বা রেশমের গুটিপোকা, এণ্ডিপলু বা এণ্ডির গুটিপোকা, মুগা পলু বা মুগার গুটিপোকা, ইত্যাদি। আমাদের দেশে সাধারণতঃ মালদহ, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় এই সব গুটিপোকার যথেষ্ট চাষ হয়

মৌমাছি

মৌমাছির মত ব্যস্ত পতঙ্গ খুব কমই দেখা যায়। দুঃসময়ে যাতে ভালভাবে থাকা যায়, খাবারের কোন অভাব না হয়, সেজন্য মৌমাছির চেষ্টার অন্ত নেই, মৌচাকের ঘরগুলিতে মধু সঞ্চয়ের কাজে সে সমস্তক্ষণই নিজেকে ব্যস্ত রাখে।

শ্রেণীভেদ—কিন্তু মনে কোর না যে, মৌমাছিরা সবাই একই কাজ করে। মৌমাছির মধ্যে সাধারণতঃ তিনটি শ্রেণী দেখা যায়—**পুরুষ মৌমাছি**, **রানী** বা **স্ত্রী মৌমাছি**, এবং **শ্রমিক বা কর্মী মৌমাছি**। কাজ করে শুধু কর্মী মৌমাছিরাই।

দেহের গঠন ও আকার—অন্যান্য পতঙ্গের মত মৌমাছির দেহেও তিনটি ভাগ। মাথার কাছে যে শুঁড় আছে, তাই দিয়ে তারা ফুল থেকে মধু চুষে খায়। তাদের ডানা চারটি,

আর পা ছয়টি। রানী বা স্ত্রী মৌমাছি আকারে সবচেয়ে বড় ও লম্বা হয়, রানীর চেয়ে কিছু ছোট হয় পুরুষ মৌমাছি, আর সবচেয়ে ছোট হয় শ্রমিক মৌমাছি। পুরুষ মৌমাছির কোন হুল নেই ; হুল আছে শ্রমিক ও স্ত্রী মৌমাছিদের পেটের শেষে লেজের কাছে। শত্রুর দেহে এই হুল ফুটিয়ে তারা আত্মরক্ষা করে।

মৌমাছি
ডিম
পুত্তলি
পোকা
রাণী
পুরুষ
কর্মী
মৌমাছির পিছনের পা

কর্মী মৌমাছির পায়ে ঠিক চিরুনির মত লোম বা শুঁয়ো সাজান থাকে। তাছাড়া পিছনের পায়ে থাকে একটা থলি। তাকে পরাগ-থলি বলতে পার। মৌমাছি ফুলের উপর বসলে তার গায়ের ও পিঠের লোমে এবং শুঁড়ে পরাগ লেগে যায়। সে তখন পায়ের ঐ চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে পরাগগুলি পিছনের পায়ের থলিতে এনে জড়ো করে। তারপর পরাগের সঙ্গে মধু মিশিয়ে সে বাচ্চাদের জন্য খাবার তৈরি করে এবং জমা করে রাখে চাকের ভাঁড়ার ঘরে।

মৌমাছির সমাজ ও জন্মকথা—মৌচাককে বলা যায় মৌমাছিদের শহর। মানুষের মত মৌমাছিও মৌচাকে হাজার হাজার ঘর তৈরি ক'রে সমাজ বেঁধে বাস করে। চাকের প্রত্যেকটি ঘরই হয় ছ'কোনা। এক একটি চাকে বাস করে হাজার হাজার মৌমাছি।

চাকে পুরুষ মৌমাছি থাকে কয়েকটি, রানী মৌমাছি থাকে মাত্র একটি; অবশিষ্ট হাজার হাজার মৌমাছি সবাই শ্রমিক বা কর্মী। পুরুষ মৌমাছিগুলি অত্যন্ত কুড়ে, চাকের কোন কাজই তারা করে না। রানী মৌমাছিই চাকের সর্বময় কর্ত্রী, কিন্তু সে-ও কাজ করে না কিছুই। তার কাজ শুধু ডিম পাড়া। চাকের যাবতীয় কাজ করে শ্রমিক মৌমাছি। মধু ও পরাগ সংগ্রহ করা, ডিম ও বাচ্চাদের লালন-পালন করা, মৌচাক তৈরি করা, চাকের ঘরদোর পরিষ্কার রাখা, ইত্যাদি সব কাজই তাদের করতে হয়।

চাকে ডিম পাড়ার জন্য আলাদা সব কুঠরি থাকে। রানী প্রত্যেক কুঠরিতে একটা করে একসঙ্গে বহু ডিম পাড়ে। দিন তিনেকের মধ্যে ডিম থেকে বেরিয়ে আসে শূক বা লার্ভা।
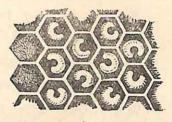
ডিম সমেত মৌচাকের কুঠরি

প্রথম দিকে শ্রমিকরা নিজেদের দেহ থেকে এক রকম মিষ্ট রস বের করে তাদের খাওয়ায়, পরে খেতে দেয় পরাগ ও মধু দিয়ে তৈরী খাবার। যে সমস্ত শূক পরে স্ত্রী মৌমাছিতে পরিণত হবে, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তাদের দিকে নজরটা একটু বেশী দেওয়া হয়। প্রায় সপ্তাহখানেক পরে শ্রমিকরা লার্ভার কুঠরির খোলা মুখ মোম দিয়ে বন্ধ করে দেয়। তারপর প্রজাপতির মতই লার্ভা গুটি তৈরি করে, পিউপায় পরিণত হয় এবং দিন দশ-বার পরে পূর্ণাঙ্গ মৌমাছিরূপে কুঠরির বাইরে বেরিয়ে আসে।

চাকের জীবনযাত্রা ২।৩ মাস বেশ শান্তিতেই কাটে। চাকের তখন জমজমাট অবস্থা। ইতিমধ্যে বাচ্চা স্ত্রী মৌমাছিগুলি পূর্ণবয়স্ক হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে চাকে দেখা দেয় অশান্তি, ঝগড়াঝাঁটি। প্রত্যেক স্ত্রী মৌমাছিই রানী হতে চায়। ক্ষমতা নিয়ে মারামারি চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত পুরান রানী-মা একদল শ্রমিক ও কয়েকটি পুরুষ মৌমাছিকে সঙ্গে নিয়ে চাক ছেড়ে চলে যায় এবং অন্যত্র গিয়ে বাসা বাঁধে। তারপরেও নতুন স্ত্রী মৌমাছিদের মধ্যে মারামারি চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত যে জেতে সেই চাকের রানী হয়।

পিঁপড়া

কীট-পতঙ্গের মধ্যে পিঁপড়াই বোধ হয় আমাদের সবচেয়ে পরিচিত। পিঁপড়ার মত এমন কর্মঠ, এমন অধ্যবসায়ী, বুদ্ধিমান প্রাণী খুব কমই দেখা যায়। নানা জাতের পিঁপড়া আছে পৃথিবীতে। তাদের মধ্যে লাল পিঁপড়া, কালো পিঁপড়া, ক্ষুদে পিঁপড়া, ডেঁয়ো পিঁপড়া, কাঠ পিঁপড়া, নাল্‌সো পিঁপড়া, মেঝেল পিঁপড়া প্রভৃতি সচরাচর দেখা যায়।

শ্রেণীভেদ—মৌমাছির মত পিঁপড়ারাও মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত—রানী পিঁপড়া, পুরুষ পিঁপড়া আর কর্মী বা শ্রমিক পিঁপড়া। সাধারণতঃ কর্মী পিঁপড়াই আমাদের চোখে পড়ে। আকারে সবচেয়ে বড় হয় রানী পিঁপড়া, তারপরেই পুরুষ পিঁপড়া। কর্মী পিঁপড়া হয় সবচেয়ে ছোট।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—পিঁপড়ার দেহ অন্যান্য পতঙ্গের মতই; রানী পিঁপড়া ও পুরুষ পিঁপড়ার দু'জোড়া করে ডানা থাকে।

কর্মীদের কোন ডানা থাকে না। অন্যান্যদের তুলনায় রানীর পেটটা হয় বেশী লম্বা ও মোটা। কর্মীদের মাথাটা হয় প্রায় গোল। তাদের মুখের দু' পাশে ঠোঁটের মত দুটি দাড়া থাকে।

জন্মকথা—মৌমাছির মত পিঁপড়ার জীবনেও স্তর চারটি। রানী পিঁপড়া ছোট ছোট সাদা ডিম পাড়ে। তারপর ডিম থেকে লার্ভা বা শূক, শূক থেকে পিউপা এবং পিউপা থেকে সময় মত পূর্ণাঙ্গ পিঁপড়া বেরিয়ে আসে। মাছ ধরার জন্যে পিঁপড়ার ডিম বলে যা বিক্রি হয়, তা হল পিঁপড়ার পিউপা।

পিঁপড়া
ডিম
লার্ভা
পিউপা
রানী
পুরুষ
কর্মী
সৈনিক

সমাজ জীবন—পিঁপড়ার মধ্যে সবাই কিন্তু পরিশ্রমী নয়। পুরুষ পিঁপড়ারা কুড়ের বাদশা। রানী মৌমাছিদের মত রানী পিঁপড়ার কাজও শুধু ডিম পাড়া। সমাজের সমস্ত কাজ, অর্থাৎ ঘর-বাড়ি তৈয়ারি করা, পাহারা দেওয়া, খাবার যোগাড় করা, শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা, ডিম ও বাচ্চাদের লালন-পালন করা প্রভৃতি সবই কর্মী পিঁপড়ারা ক'রে চলে ঘড়ির কাঁটার মত নিরলসভাবে। কর্মীদের মধ্যে আছে সৈনিক পিঁপড়া। তাদের মাথা বেশ বড় ও মোটা। আক্রমণকারী শত্রুর সঙ্গে লড়াই ক'রে তারা রক্ষা করে নিজেদের সমাজকে।

পিঁপড়ারা যেখানে বাস করে, সে জায়গা যেন এক নগর বিশেষ। সারি সারি ঘর—কোন ঘরে থাকে ডিম, কোন ঘরে থাকে লার্ভা, কোন ঘরে পিউপা, কোন ঘরে আবার কেবল খাবারই থাকে। পিঁপড়াদের মধ্যে একতা অদ্ভুত। এখানেই মৌমাছিদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য। পিঁপড়ার বাসায় একাধিক স্ত্রী-পিঁপড়া মিলেমিশে থাকে। কোনই গণ্ডগোল হয় না।

সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হল, পিঁপড়ারা মানুষের মত চাষ-আবাদ করে, গরু পোষে। বাসার কাছে তারা ব্যাঙের ছাতা জাতীয় এক ধরনের জিনিসের চাষ করে। বর্ষাকালে যখন বাড়ি থেকে বের হওয়া প্রায় বন্ধ থাকে, তখন তারা এই জিনিস খেয়ে জীবনধারণ করে। সবুজ রঙের খুব ছোট একরকম পোকাকে তারা গরুর মত পোষে। এইসব পোকার গা থেকে একজাতীয় মিষ্টি রস বের হয়, পিঁপড়ারা তাই খায়।

সব পিঁপড়ার বাসা কিন্তু এক ধরনের নয়। কোন পিঁপড়া মাটির তলার গর্তে, কোন পিঁপড়া গাছের কোটরে, কেউ বা আবার গাছের ডালে পাতা দিয়ে ঘর তৈরি করে বাস করে।

মশা

মশার মত অপকারী পতঙ্গ খুব কমই আছে। নানারকম রোগ হয় তাদের কামড়ে। সাধারণতঃ দু'জাতের মশা দেখা যায়,—**এনোফলিস** আর **কিউলেক্স**। এনোফিলিস বহন করে ম্যালেরিয়ার বীজ। কিউলেক্স বহন করে ফাইলেরিয়ার বীজ।

এনোফিলিস আর কিউলেক্স মশার মধ্যে স্বভাব ও চেহারায় বেশ পার্থক্য আছে। এনোফিলিস কিউলেক্সের চেয়ে আকারে ছোট। তার ডানায় আছে কালো কালো ছিট দাগ; কিউলেক্সের ডানায় এরকম কোন দাগ নেই। ওড়ার সময় কিউলেক্সের ডানায় গুন গুন শব্দ হয়, এনোফিলিস ওড়ে নিঃশব্দে। এনোফিলিস সাধারণতঃ দিনের আলোয় বেরোয় না, কিউলেক্স বেরোয় সব-সময়। এনোফিলিসের শরীর সোজা, কিউলেক্সের কুঁজো। এনোফিলিস কোথাও বসলে দেহটি মোটেই না বাঁকিয়ে মাথা নীচের দিকে রেখে পিছন দিকটা উঁচু করে বসে; কিন্তু কিউলেক্স বসে কুঁজো হয়ে, কোমর বাঁকিয়ে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—মশাও একটি পতঙ্গ। তারও দেহে তিনটি অংশ—মাথা, বুক আর পেট। মশার ডানা দুটি, শুঁড় একজোড়া আর নল একটি।
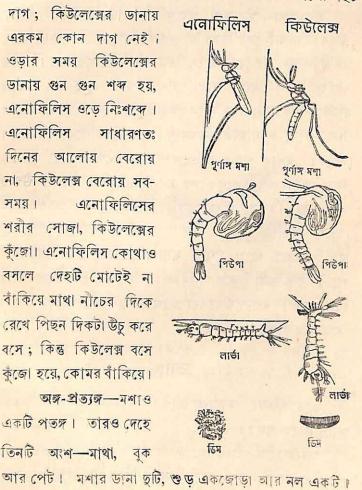
এই নল দিয়ে স্ত্রী মশা অন্য প্রাণীর দেহ থেকে রক্ত শুষে খায়। পুরুষ মশা তা পারে না। তার নলের মুখটি ভোঁতা। ফুল, ফল ও ঘাসপাতার রস সে খায়, কিন্তু বাঁচে না বেশী দিন।

জন্ম কথা—স্ত্রী মশা প্রথমে জলে **ডিম** পাড়ে। জলের উপর এনোফিলিসের ডিমগুলি ভাসে আলাদা আলাদা ভাবে, কিন্তু কিউলেক্সের ডিম ভাসে একসঙ্গে নৌকোর মত। ডিম থেকে কয়েক দিনের মধ্যে বেরিয়ে আসে **শূক** বা **লার্ভা**। কিউলেক্সের লার্ভা জলে ভাসে লেজ উপর দিকে ও মাথা নীচের দিকে দিয়ে, এনোফিলিসের লার্ভা ভাসে জলের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে। মশার শূকগুলি একেবারে রাম-পেটুক, যা সামনে পায়, তাই খায়। শূকের দেহ ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে **পিউপায়** পরিণত হয়। দেহটি তখন হয় ঠিক মাছ ধরার বঁড়শির মত অথবা ছেদচিহ্ন 'কমা'র মত। তারপর একদিন গুটি ফেটে যায়, বেরিয়ে আসে **পূর্ণাঙ্গ মশা**। খোলস থেকে বেরোবার পরেই কিন্তু তারা উড়তে পারে না। কিছুক্ষণ খোলসের উপর বসে থাকে। তারপর হাওয়া লেগে ডানা শক্ত হলে, জল ছেড়ে উড়ে যায় খাবারের খোঁজে।

ব্যাঙ

ব্যাঙ উভচর মেরুদণ্ডী প্রাণী। তারা জলে স্থলে সমান ভাবে চলতে পারে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—ব্যাঙ আছে অনেক জাতের। সাধারণতঃ দু'জাতের ব্যাঙ দেখা যায়—**সোনা** ব্যাঙ এবং **কুনো** ব্যাঙ।

সোনা ব্যাঙ দেখতে খুব বড়, সাধারণতঃ জলের ধারে বাস করে। তার চামড়ার রং হলদে, তার উপর ডোরাকাটা। কুনো ব্যাঙের চেহারা অত্যন্ত কুৎসিত। তাদের দেখা যায় বাড়ির আনাচে-কানাচে, গর্তের মধ্যে বা দেওয়ালের ফাটলে। তাদের গায়ের চামড়া ছাই রঙের, চামড়ার উপর আঁচিলের মত চাকা চাকা গুটি থাকে। স্পর্শ করলেই সেই গুটি থেকে এক জাতীয় রস বের হয়। ব্যাঙের শরীরে ঘাড় বলে কিছু নেই, আছে কেবল তুটি অংশ—মাথা আর দেহ। মাথাটা মস্ত বড়। মাথার উপরে বড় বড় তুটি ড্যাবা ড্যাবা গোলাকার চোখ।

বাঙের জিভটি অদ্ভুত ধরনের। আমাদের জিভের গোড়া থাকে মুখের ভিতরে, গলার কাছে—আগা থাকে সামনে দাঁতের কাছে। ব্যাঙের ঠিক তার উল্টো। তাদের জিভের গোড়া থাকে সামনে, আর ডগাটি ভাঁজ করা অবস্থায় গুটান থাকে মুখের ভিতর দিকে। যখনই পোকামাকড় ধরার দরকার হয়, ব্যাঙ চোখের পলকে জিভের ডগাটা সামনের দিকে বের করে দেয়। জিভের আঠায় শিকার আটকে যায়। সঙ্গে সঙ্গে শিকার সমেত জিভও আবার ঢুকে যায় মুখের ভিতর।

জিভ দিয়ে ব্যাঙের শিকার ধরা

ব্যাঙের শ্বাসকার্য ভারী অদ্ভুত। প্রথমে নাক দিয়ে তারা বাতাস টেনে মুখের মধ্যে পোরে, তারপর নাক ও মুখ বন্ধ

করে সেই বাতাস গিলে ফুসফুসে পাঠায়। তাই মুখ খুলে রাখলে ব্যাঙ শ্বাস নিতে পারে না, দম বন্ধ হয়ে মারা যায়। ব্যাঙের পা চারখানা। পিছনের পা দু'খানা সামনের দুটির চেয়ে বেশ লম্বা। চলবার সময় ব্যাঙ তাই থপ থপ করে চলে এবং লাফ দিতে পারে খুব জোরে। সামনের পা দুটিতে আঙুল আছে চারটি, কিন্তু পিছনের পায়ে আছে পাঁচটি এবং তা হাঁসের পায়ের মত চামড়ার পাতলা পরদা দিয়ে পরস্পর জোড়া। তার ফলে ব্যাঙ অনায়াসে জলে সাঁতার কাটতে পারে।
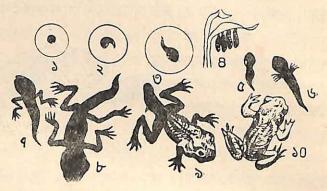
জন্মকথা—বর্ষার গোড়ার দিকে স্ত্রী ব্যাঙ জলে ডিম পাড়ে। ডিমগুলি দেখতে হয় অনেকটা কালো কালো পোস্তদানার মত এবং গঁদের আঠার মত একরকম জিনিসের সাহায্যে তারা পরস্পরের সঙ্গে লেগে থাকে।

২।১ দিনের মধ্যে সেগুলি মটর-দানার আকার ধারণ করে। তারপর, দিন পনের কুড়ির মধ্যে ডিম থেকে বেরিয়ে আসে বাচ্চা। তখন তাদের চোখ মুখ কিছুই থাকে না।

মাথার দিকে একরকম আঠার সাহায্যে জলজ লতাপাতায় মুখ আটকে তারা ঝুলতে থাকে। ৩।৪ দিনের মধ্যেই তাদের চোখ মুখ দেখা দেয়। তখন তাদের বলা হয় **ব্যাঙাচি**। লেজ নেড়ে নেড়ে ব্যাঙাচির ঝাঁক মাছের বাচ্চার মত জলে সাঁতার কেটে বেড়ায়। ধীরে ধীরে তাদের মাথার দু'পাশে ফুলকা বের হয়। ফুলকার সাহায্যে তারা মাছের মত শ্বাসকার্য চালায়, আর জলের কচি লতাপাতা খেয়ে বড় হতে থাকে। ৬।৭ সপ্তাহের মধ্যে লেজের ঠিক উপরে দেহের দু'পাশে পিছনের পা দুটি দেখা দেয়। সামনের পা দুটি বের হয় আরো পরে। ৩।৪ মাস বয়সে ব্যাঙাচির অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ও ফুসফুসের সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে ফুলকা অদৃশ্য হয় এবং ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চলতে থাকে। একমাত্র লেজ ছাড়া তারা তখন দেখতে হয় ঠিক ব্যাঙেরই মত। ধীরে ধীরে লেজ ছোট হয়ে আসতে থাকে এবং ব্যাঙাচি হয়ে ওঠে পূর্ণাঙ্গ **ব্যাঙ**। ব্যাঙের প্রধান খাদ্য পোকামাকড়।

অনুশীলনী

১। পতঙ্গ বলতে কাদের বুঝায়? পতঙ্গ সম্বন্ধে কি জান? ২। প্রজাপতির জীবনের বিভিন্ন স্তরগুলি বুঝিয়ে বল। মথ ও প্রজাপতির পার্থক্য কি? ৩। পিঁপড়ার সমাজ-জীবনের বর্ণনা দাও। ৪। ব্যাঙের জীবন-কথা বল। ব্যাঙ কিভাবে শ্বাসকার্য চালায়? তাদের জিভের সঙ্গে আমাদের জিভের পার্থক্য কোথায়? ৫। রানী ও কর্মী মৌমাছি সম্বন্ধে কি জান, বল। মৌমাছির সমাজ-জীবনের বর্ণনা দাও। ৬। মশা কয় রকমের? কোন্ মশা কি রোগের বীজ বহন করে? মশার জীবনে কয়টি স্তর?

চতুর্থ অধ্যায়

মানবদেহের সাধারণ জ্ঞান

কঙ্কাল

মাটি দিয়ে কোন মূর্তি বা প্রতিমা তৈরি করতে গেলে, আগে একটা শক্ত কাঠামো তৈরি করে নিতে হয়। সুন্দর এই মানবদেহের মধ্যেও এইরকম একটি শক্ত কাঠামো আছে। কাঠামোটি অস্থি বা হাড় দিয়ে তৈরী। সমগ্র কাঠামোটিকে একসঙ্গে বলা হয় **কঙ্কাল**। কঙ্কল না থাকলে আমাদের নির্দিষ্ট কোন আকার থাকত না; আমরা হতাম কিম্ভুত-কিমাকার এক মাংসপিণ্ড মাত্র।
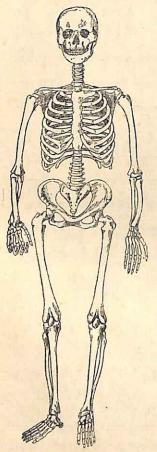
নর-কঙ্কাল

হাড়ের কাজ শরীরকে শক্ত ও মজবুত রাখা এবং অঙ্গসঞ্চালনের সহায়তা করা। শরীরের বহু গুরুত্বপূর্ণ কোমল অংশকে নিরাপদে রাখাও হাড়ের অন্যতম কাজ;—যেমন, আমাদের পাঁজরের হাড়ের আড়ালে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস দুটি অবস্থিত; হাড়ের করোটি দিয়ে ঢাকা রয়েছে সম্পূর্ণ মস্তিষ্কটি।

মানুষের শরীরে হাড় আছে ২০৬ খানা। এই সব হাড় কিন্তু ছাড়া-ছাড়া নয়—একটির

সঙ্গে আর একটির জোড় বা **সন্ধি** আছে। দু'খানা হাড়ের মধ্যে যে জায়গায় এই সন্ধি হয়, তাকে বলে **অস্থিসন্ধি** ; সেখানটা আমরা এদিক-ওদিক নাড়াচাড়া করতে পারি ; যেমন—কনুই, হাঁটু, বগল, ইত্যাদি। কোন কোন সন্ধি আবার অনড় ; যেমন—মাথার খুলি বা করোটির জোড়।

পেশী

দেহের মাংস বলতে আমরা যা বুঝি,, তার সবটাকেই বলা হয়, **পেশী**। এই পেশী আছে বলেই অঙ্গসঞ্চালন ও চলাফেরা করা সম্ভব হয়। কারণ, পেশী সহজেই সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হয়। কতকগুলি পেশীকে আমরা ইচ্ছামত সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করতে পারি ; যেমন,—হাত, পা, ইত্যাদি। আবার কতকগুলি পেশী আপনা থেকেই সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয় ; যেমন,—হৃৎপিণ্ড।

দাঁত

দাঁত হাড়ের মত কঠিন হলেও হাড় নয়। পূর্ণবয়স্ক একজন লোকের মুখে স্থায়ী দাঁত থাকে ৩২টি—প্রত্যেক পাটিতে ১৬টি করে। তোমাদের কিন্তু স্থায়ী দাঁত সব এখনো ওঠেনি। গুনে দেখ, বড়জোর ২৮টি হবে।

পরিপাক ক্রিয়া

শরীরের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি এবং শক্তির জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। কিন্তু আমরা যে-সব খাদ্য খাই, দেহ তার কোনটাই সরাসরি কাজে লাগাতে পারে না। উদরের মধ্যে

গিয়ে তা ঠিকমত রূপান্তরিত হয়। খাদ্যবস্তুকে এই ভাবে দেহের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় রূপান্তরিত করাকে বলা হয় পরিপাক ক্রিয়া, অর্থাৎ হজম কার্য।
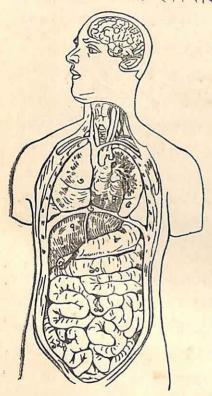
১। মস্তিষ্ক, ২। শ্বাসনালী, ৩ ও ৫। ফুসফুস, ৪। হৃৎপিণ্ড, ৭। যকৃত, ৮। পাকস্থলী, ১০ ও ১১। বৃহদন্ত্র, ১২। ক্ষুদ্রান্ত্র।

মুখ থেকে মলদ্বার পর্যন্ত একটি দীর্ঘ নল বা পথ আছে। এই নলের প্রথম অংশের একই পথে শ্বাস-প্রশ্বাস ও খাদ্য গ্রহণের কাজ চলে। কিন্তু একটু নীচে এসে নলটি দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একটিকে বলে শ্বাসনালী, অপরটিকে বলে পৌষ্টিক নালী। খাদ্যকে প্রথমে মুখের ভিতর দাঁত দিয়ে চিবিয়ে জিভ দিয়ে উল্টে-পাল্টে লালার সঙ্গে মিশিয়ে মণ্ডের মত করা হয়। তারপর সেই খাদ্য পৌষ্টিক নালী দিয়ে ক্রমশঃ মুখ থেকে মলদ্বারের দিকে চালিত হয়। খাদ্য প্রথমেই প্রবেশ করে পাকস্থলীতে। পাকস্থলী থেকে নানা রকম জারক রস বের হয়।

জারক রসের সাহায্যে খাদ্য সেখানে আংশিক পরিবর্তিত হয়ে তরল মাড়ের আকার গ্রহণ করে।

পাকস্থলীর পর পৌষ্টিক নালীর বাকি অংশ **অন্ত্র** নামে পরিচিত। সহজ কথায় আমরা একে নাড়িভুঁড়ি বলি। এর আবার দুটি প্রধান অংশ—**ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্র**। প্রথমাংশকে ক্ষুদ্রান্ত্র বলা হয়। ক্ষুদ্রান্ত্র লম্বায় বড়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত সরু। বৃহদন্ত্র অনেকটা মোটা। দেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি যকৃৎ বা লিভার। এটি উদরের ডানদিকে থাকে। যকৃৎ ও অন্যান্য গ্রন্থি থেকে নানা রকম পাচক রস বের হয়। একটি নলের সাহায্যে এই সব রস ক্ষুদ্রান্ত্রে যায়। পাকস্থলীর কাজ সম্পূর্ণ হলে সেখান থেকে খাদ্যবস্তু অল্প অল্প পরিমাণে ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে। যকৃতাদি থেকে নানা পাচক রস এসে এখানে খাদ্য হজমের কাজ সম্পূর্ণ করে। ক্ষুদ্রান্ত্রের পরবর্তী অংশ খাদ্যের সারাংশ শোষণ করে। শোষিত সারাংশ রক্ত-প্রবাহের সাহায্যে দেহের সব জায়গায় চালিত হয়।

খাদ্যের অসার অংশটুকু এইবার বৃহদন্ত্রে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে, লবণ ও জলীয় অংশ এখানে দেহে শোষিত হয় এবং বাকি অংশ মলরূপে বৃহদন্ত্রের শেষ দিকে **মলভাণ্ডে** জমা হয়। দৈনিক একবার কি দু'বার মলদ্বার খুলে গিয়ে এই ল শরীর থেকে বোরয়ে যায়।

রক্ত

অণুবীক্ষণ-যন্ত্র দিয়ে এক ফোঁটা রক্ত পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, ঈষৎ হলদে রঙের তরল পদার্থে অনেকগুলি

লোহিত বা লাল কণিকা এবং কতকগুলি শ্বেত কণিকা ভাসছে। লোহিত কণিকার তুলনায় শ্বেত কণিকা সংখ্যায় কম, কিন্তু আকারে বড়। লোহিত কণিকাগুলি সংখ্যায় বেশী বলে রক্ত লাল দেখায়। লোহিত ও শ্বেত কণিকাগুলি যে তরল পদার্থে ভাসে, তার নাম রক্তমস্তু বা 'সিরাম'। একজন জোয়ান লোকের শরীরে রক্ত আছে প্রায় সাড়ে চার সের।

রক্তের অন্যতম প্রধান কাজ হল দেহের বিভিন্ন অংশে খাদ্য ও অক্সিজেন সরবরাহ করা। দেহের আবর্জনা দূর করাও তার আর একটি কাজ। তা ছাড়া তাপের আদান-প্রদান করা এবং দেহের বিভিন্ন অংশে যে সব প্রয়োজনীয় নানারকম রস তৈরী হয়, তা বহন করাও রক্তের কাজ। দেহের মধ্যে রোগজীবাণু ঢুকলে তাদের ধ্বংস করে রক্তের শ্বেতকণিকা।

হৃৎপিণ্ড ও রক্তসংবহন

কিছুক্ষণ ছুটোছুটি করার পর লক্ষ্য করবে, তোমাদের বুক ঢিপঢিপ করছে। বুকের ভিতর যে যন্ত্রটি ঢিপঢিপ করছে, তারই নাম হৃৎপিণ্ড। শুধু পরিশ্রম করলেই যে এই হৃৎপিণ্ড ঢিপঢিপ করে, তা নয়। সব সময়েই হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হয়, তবে আমরা সাধারণ অবস্থায় তা টের পাই না। হৃৎপিণ্ড দেখতে অনেকটা নোনাফলের মত; আয়তনে হাতের মুঠির সমান। হৃৎপিণ্ড তৈরী হয়েছে পেশী দিয়ে এবং রয়েছে বুকের ভিতর একটু বাঁ দিক ঘেঁষে।

হৃৎপিণ্ড পালাক্রমে একবার সঙ্কুচিত ও একবার প্রসারিত হয়। পূর্ণবয়স্ক লোকের হৃৎপিণ্ড প্রতি মিনিটে ৭২ বার

সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। দু'রকম নলের সাহায্যে সমস্ত দেহের যোগাযোগ রয়েছে এই হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে। হৃৎপিণ্ড যখন প্রসারিত হয়, তখন একরকম নলের মধ্য দিয়ে দেহের দূষিত রক্ত হৃৎপিণ্ডে পৌঁছায়। এই নলকে বলা হয় শিরা। শিরার রক্তের রঙ ঈষৎ নীলাভ। হৃৎপিণ্ড থেকে আর এক রকম নল বেরিয়েছে, তাদের বলা হয় ধমনী। হৃৎপিণ্ড যখন সঙ্কুচিত হয়, তখন ঝলক দিয়ে পরিস্রুত রক্ত সঞ্চালিত হয় ধমনীর মধ্যে। ধমনী শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে সেই রক্ত পৌঁছে দেয় দেহের সমস্ত অংশে। ধমনীর রক্ত পরিষ্কার ও টকটকে লাল।

মনে রেখ, শিরা দিয়ে রক্ত হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে সোজা ধমনী দিয়ে বেরিয়ে আসে না। মাঝ পথে এই রক্ত একবার ফুসফুস থেকে ঘুরে আসে। বাতাসের অক্সিজেনের সাহায্যে ফুসফুসে রক্ত পরিষ্কার হয়ে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসার পর তার যাত্রা শুরু হয় ধমনী-পথে।

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। আপনা-আপনি তার পেশী সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। হৃৎপিণ্ডের এই কাজ চলে সমগ্র জীবন ধরে বিরামহীন ভাবে। মানুষের মৃত্যু ঘটে তখনই, যখন হৃদ্‌স্পন্দন থেমে যায়।

শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া

তোমরা জান, লোকে না খেয়ে কিছুদিন বাঁচতে পারে, কিন্তু বাতাস ছাড়া একেবারেই বাঁচে না। নাক দিয়ে শ্বাসনালী পথে বাতাস আমাদের দেহে প্রবেশ করে। শ্বাসনালী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে হৃৎপিণ্ডের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত থলির মত

ফুসফুস দুটিতে প্রবেশ করেছে। ফুসফুসের ভিতরটা অনেকটা স্পঞ্জের মত। সমস্ত ফুসফুস অসংখ্য শিরা এবং ধমনীতে পূর্ণ। শরীরের দূষিত রক্ত এই ফুসফুসে এসে বাতাসের ভিতরকার অক্সিজেনের সাহায্যে বিশুদ্ধ হয় এবং দূষিত পদার্থ কার্বন-ডাই-অক্সাইড রূপে পরিবর্তিত হয়ে ফুসফুস থেকে নিশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। বয়স্ক ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি মিনিটে হয় ১৮ বার। মনে রেখ, পরিশ্রম করলে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া ও হৃদ্‌স্পন্দন দু'-ই বেড়ে যায়।

ত্বকের কাজ

কয়েকটি স্থান ছাড়া দেহের সবটাই আমাদের ঢাকা আছে গাত্রচর্ম বা ত্বক দিয়ে। এই আবরণটি আমাদের দেহকে বর্মের মত রক্ষা করে ; এটা ভেদ করে জল বা জীবাণু ভিতরে ঢুকতে পারে না। ত্বক আমাদের **স্পর্শেন্দ্রিয়**। স্পর্শানুভূতি হয় এই ত্বক দিয়েই। ত্বকে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোমকূপ আছে। প্রত্যেক লোমকূপের ভিতর থেকে একটি করে লোম ত্বকের বাইরে আসে। লোমকূপ দিয়ে তেলের মত একটা জিনিস বেরিয়ে ত্বককে মসৃণ রাখে। লোমকূপ ছাড়া ত্বকে আরো একজাতীয় সূক্ষ্ম নালী আছে। এই নালী দিয়ে দেহের আবর্জনা ঘাম হয়ে বেরিয়ে যায়। এই নালীকে বলে স্বেদনালী। মনে রেখ, লোমকূপ ও স্বেদনালী এক নয়।

ত্বক আমাদের দেহের উত্তাপ ঠিক রাখার কাজে সাহায্য করে এবং সূর্যের আলোর সাহায্যে দেহের মধ্যেই খাদ্যের একটি প্রধান উপাদান 'ভিটামিন ডি' তৈরি করে।

মস্তিষ্ক ও নার্ভ

আমাদের দেহের মধ্যে সবচেয়ে প্রধান ও প্রয়োজনীয় অংশ হল **মস্তিষ্ক**। মস্তিষ্কই আমাদের চেতনা, অনুভূতি ও ইচ্ছার কেন্দ্র। দেহের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে মস্তিষ্কের সংযোগ রয়েছে একরকম অতি সূক্ষ্ম অসংখ্য নলের সাহায্যে। এই নলের নাম **নার্ভ**। নার্ভগুলি যেন আমাদের দেহের টেলিগ্রাফের তার। এদের কাজ মস্তিষ্কে খবর বহন করা ও মস্তিষ্ক থেকে আদেশ নিয়ে আসা। তোমার গায়ে মাছি পড়েছে এই খবর মস্তিষ্কে বয়ে নিল এক রকম নার্ভ। আর একরকম নার্ভ আবার মস্তিষ্ক থেকে তোমার হাতে আদেশ পৌঁছে দিল—মাছিটাকে তাড়াও। আর অমনি তোমার হাত উঠল মাছিটাকে চাপড় মারতে।

চোখ, কান, নাক, জিভ এবং চামড়া বা ত্বক, এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গেও মস্তিষ্কের সংযোগ রয়েছে নার্ভের মারফত। নার্ভের সাহায্যেই এই সব ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি হয়।

অনুশীলনী

১। কঙ্কাল কাকে বলে? মানবদেহে কঙ্কালের কাজ কি?

২। রক্তের উপাদান ও কাজ কি কি? দেহের ভিতর কি ভাবে রক্ত-সংবহন হয়? পেশীর কাজ কি?

৩। পরিপাকক্রিয়া কি ভাবে হয়?

৪। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের দরকার হয় কেন? শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া কি ভাবে চলে? মস্তিকের ও ত্বকের কাজ বর্ণনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

আকাশ-পর্যবেক্ষণ (১)

বাংলা দেশের আকাশ বিভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা দেয়। বিভিন্ন ঋতুতে নানাভাবে আকাশ জুড়ে চলে মেঘের খেলা। লক্ষ্য করে দেখো, কত বিচিত্র ও সুন্দর সে মেঘের রূপ!

মেঘ

গ্রীষ্মকালে মাঝে মাঝে নীল আকাশে পাতলা এক-জাতীয় মেঘ দেখা যায়। সে মেঘ থাকে খুব উঁচুতে, দেখতে অনেকটা
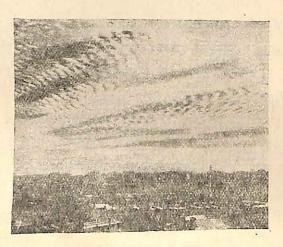
অলক মেঘ

হাল্‌কা—পাখির পালকের মত। তার নাম অলক মেঘ। এ মেঘে কখনও বৃষ্টি হয় না।

আর এক ধরনের মেঘ দেখা যায় শরৎকালে। তার নাম স্তূপ মেঘ। স্তূপ মেঘ দেখলে মনে হয়, কে যেন আকাশময়

রাশি রাশি সাদা তুলোর স্তূপ ছড়িয়ে দিয়েছে। স্তূপ মেঘ খুব উঁচুতে থাকে না, থাকে মাটি থেকে বড়-জোর মাইল খানেক উপরে। এই মেঘ থেকে সময় সময় এক-আধটু বৃষ্টি-হতেও পারে।

স্তূপ মেঘ

সাধারণতঃ বর্ষা ও শরৎকালে আকাশের গায়ে থরে থরে সাজানো থাকে আর এক-জাতীয় মেঘ। তার নাম স্তর মেঘ। এ মেঘে বৃষ্টি হয় না। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্যের রক্তরশ্মি তার গায়ে নানা রঙের সৃষ্টি করে।

আর এক-জাতীয় মেঘ আছে। তাকে বলে বাদল মেঘ। তার রঙ হয় কালো অথবা ছাই রঙের। নাম থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, বাদল মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। খুব উঁচুতে এ মেঘ থাকে না, পৃথিবীর খুব কাছেই ভেসে বেড়ায়।

মেঘ ও বৃষ্টি

সূর্যের তাপের ফলে সমুদ্র, নদী, খাল, বিল, পুকুর প্রভৃতি সব জায়গা থেকে জল বাষ্পে পরিবর্তিত হয়। জলীয় বাষ্প

বাতাসের চেয়ে হাল্কা। তাই এই বাষ্প উপরের দিকে উঠে যায়, আর ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ছড়িয়ে পড়ার ফলে জলীয় বাষ্প ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হতে থাকে। তাছাড়া, উপরের বায়ুমণ্ডল এমনিতেই বেশ ঠাণ্ডা। বাতাস ঠাণ্ডা হলে, তার জলীয় বাষ্প ধরে রাখার ক্ষমতা কমে যায়। উপরের বাতাস ঠাণ্ডা হওয়ায় জলীয় বাষ্প আর বাষ্পরূপে থাকতে পারে না; সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণায় পরিবর্তিত হয়। আকাশে ভাসমান অসংখ্য ধূলিকণাকে আশ্রয় করে জলকণাগুলি জমে ওঠে। তখন তার নাম হয় **মেঘ।**

উপরের বায়ুস্তর যদি আরও ঠাণ্ডা হয়, তখন মেঘের জলকণাগুলি আরও বড় এবং ভারী হয়ে ওঠে। তখন আর তা আকাশে ভেসে থাকতে পারে না। পৃথিবীর বুকে নেমে আসে—কখনো ঝির ঝির করে, কখনো বা মুষলধারে অবিশ্রান্ত জলধারায়। তখন তার নাম হয় **বৃষ্টি।**

শিশির

শরৎ থেকে বসন্তকাল পর্যন্ত, বিশেষতঃ হেমন্ত ও শীতের সময় ভোর বেলায় তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ, ঘাসের ডগায়, গাছের পাতায়, মুক্তার মত টলমল করে ছোট্ট ছোট্ট কত জলবিন্দু। এদের বলা হয় শিশির বিন্দু। তারা আসে কোথা থেকে?

বাতাসের মধ্যে সব সময়ই কিছু-না-কিছু জলীয় বাষ্প থাকে। শীতের সময় রাত্রিতে ঠাণ্ডা পড়ে। পৃথিবীও তাই সে সময় ঠাণ্ডা হয়। জলীয় বাষ্প সমেত বাতাসও তখন মাটির

কাছাকাছি ঠাণ্ডা জিনিসের সংস্পর্শে এসে ঠাণ্ডা হয়। ঠাণ্ডা হলে সে আর জলীয় বাষ্প ধরে রাখতে পারে না। জলীয় বাষ্প তখন ঘাসের ডগায়, গাছের পাতায় এবং অন্যান্য ঠাণ্ডা জিনিসের উপর জলবিন্দু অর্থাৎ শিশিরবিন্দু রূপে দেখা দেয়।

একটা কাঁচের গেলাসে খানিকটা বরফ রেখে তোমরাও এটা পরীক্ষা করে দেখতে পার। দেখবে, গেলাসের বাইরে ফোঁটা ফোঁটা জল জমেছে। এই জল বাতাসের মধ্যেই জলীয় বাষ্প হয়ে লুকিয়ে ছিল। বরফ রাখায় গেলাস ঠাণ্ডা হয়েছে, আর সেই ঠাণ্ডার সংস্পর্শে এসে জলীয় বাষ্প জলকণায় পরিণত হয়েছে।

আকাশ-পর্যবেক্ষণ (২)

মাথার উপরে অনন্ত আকাশ। ভোরবেলায় পুব আকাশ লাল করে সূর্য ওঠে, সারাদিন আমাদের আলো ও তাপ বিতরণ করে দিনের শেষে সে পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যায়। তারপর সন্ধ্যা নামে, নামে রাত্রির গাঢ় অন্ধকার। কিন্তু চাঁদ উঠলে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় সারা পৃথিবী প্লাবিত হয়।

রাত্রির মেঘমুক্ত আকাশে যেমন চাঁদ ওঠে, তেমনি ওঠে অসংখ্য তারকা। দিনের বেলায়ও এরা আকাশে থাকে, কিন্তু সূর্যের তীব্র আলোয় তখন চোখে পড়ে না। এদের মধ্যে অধিকাংশই **নক্ষত্র** বা **তারা**। নক্ষত্রগুলির নিজস্ব আলো আছে। সেজন্যই এরা মিটমিট করে, ঝিকিমিকি জ্বলে আর

নেভে। যাদের নিজস্ব আলো বা জ্যোতি আছে, তাদের জ্যোতিষ্ক বলা হয়। সূর্যেরও নিজস্ব আলো আছে। সূর্যও তাই নক্ষত্রগুলির মতই একটা জ্যোতিষ্ক।

রাত্রিতে নক্ষত্রগুলি ছাড়া আর যাদের দেখা যায়, তাদের সংখ্যা খুবই কম। তাদের নিজস্ব কোন আলো নেই। আলো
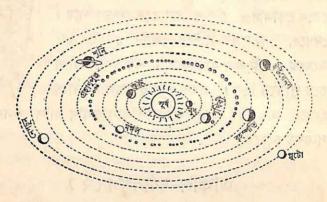
তাদের নিষ্কম্প, সুস্থির,—ঝিকিমিকি জ্বলে না। সূর্য থেকে ধার-করা আলোয় এরা আলোকিত। সূর্যের দেহ থেকেই এরা জন্মেছে, সূর্যকে কেন্দ্র করে তারই চারপাশে নিজ নিজ কক্ষপথে এরা অবিরাম ঘুরছে। এদের তাই বলা হয় **গ্রহ**। এ ছাড়াও আছে **গ্রহাণুপুঞ্জ**। সূর্যের গ্রহ আছে নয়টি। সূর্যকে কেন্দ্র করে এরা ঘুরছে। সূর্য থেকে পরপর প্রধান গ্রহগুলির নাম—বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস্, নেপচুন ও প্লুটো। এদের মধ্যে প্লুটো সবচেয়ে ছোট এবং বৃহস্পতি সবচেয়ে বড়। সূর্য বা অন্যান্য নক্ষত্রের তুলনায় গ্রহগুলি কিন্তু অনেক—অনেক ছোট। পৃথিবী ছাড়া অন্য

কোন গ্রহে এ পর্যন্ত জীবনের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। গ্রহগুলিকে নিয়েই সূর্যের সুবিশাল সংসার বা পরিবার। এই পরিবারকে বলা হয় **সৌরমণ্ডল**।

অন্যান্য গ্রহের মত পৃথিবীও ঘুরছে সূর্যের চারপাশে। অথচ কিছুকাল আগে পর্যন্তও মানুষের ঠিক বিপরীত ধারণাই ছিল। তারা মনে ক'রত পৃথিবী স্থির আছে, আর সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি তাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে।

চাঁদ কিন্তু সূর্যের গ্রহ নয়। পৃথিবীর দেহ থেকেই তার জন্ম হয়েছে এবং ঘুরছে সে পৃথিবীকেই কেন্দ্র করে। সেজন্য তাকে বলা হয় পৃথিবীর **উপগ্রহ**। তারও নিজস্ব কোন আলো নেই। সূর্যের আলোকেই সে আলোকিত হয় এবং সেই আলোকেরই কিছু অংশ প্রতিফলিত হয়ে জ্যোৎস্না রূপে পৃথিবীতে আসে।

সূর্য

সূর্যের আয়তন ও দূরত্ব—সূর্যকে মনে হয় একখানা ছোট থালার মত। কিন্তু আসলে সূর্য কত বড়, জান? আমাদের এই পৃথিবীকেই আমরা খুব বিরাট মনে করি। সূর্য এই পৃথিবীর চেয়ে তের লক্ষ গুণ বড়, অর্থাৎ পৃথিবীর মত তের লক্ষ পৃথিবী সূর্যের মধ্যে ঢুকতে পারে।

এত বড় যে সূর্য, তাকে দেখায় ছোট একখানা থালার মত। কারণ সূর্য আছে আমাদের থেকে বহু দূরে—ন' কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে। ধারণা করতে পার এই দূরত্ব? একখানা রেলগাড়ি যদি ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে পৃথিবী থেকে

সূর্যের উদ্দেশ্যে আকাশপথে অবিরাম চলতে থাকে, তাহলে সে সূর্যে পৌঁছবে তিন শ' পঞ্চাশ বছর পরে।
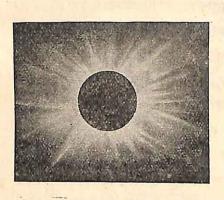
সূর্যের চারিধার

কিন্তু সত্যই কি ট্রেনখানা সূর্যে পৌঁছতে পারবে? না; কিছুদূর যাবার পরই সূর্যের তাপে সে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কারণ সূর্য আসলে একটা বিরাট জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ড; অনন্ত কাল ধরে অবিরাম জ্বলছে দাউ দাউ করে। সূর্য এত দূরে আছে, তবু তার দিকে আমরা তাকাতে পারি না। গ্রীষ্মকালে কয়েক দিন বৃষ্টি না হলে অসহ্য তাপে আমরা হাঁপিয়ে উঠি। এমনি তার তেজ ও জ্যোতি! এত দূরে থাকা সত্ত্বেও যদি আমাদের এই অবস্থা হয়, সূর্যের মধ্যে তাহলে কি প্রচণ্ড তাপ রয়েছে, একবার ভেবে দেখ।

সূর্যের কাজ—সূর্য আমাদের পরম বন্ধু। সূর্য না থাকলে আমরা বাঁচতাম না। জীবনের চিহ্নও থাকত না পৃথিবীর বুকে। সূর্য থেকে আসে আলোক ও তাপ। সূর্যালোকের সাহায্যে পাতার সবুজ কণা গাছের খাদ্য তৈরী করে। সুতরাং সূর্য না থাকলে পৃথিবীতে উদ্ভিদ থাকত না। আবার, উদ্ভিদ থেকেই প্রাণী-জগৎ বেঁচে আছে। সিংহ, বাঘ প্রভৃতি মাংসাশী জন্তুগুলি উদ্ভিদ না খেলেও, উদ্ভিদ-ভোজী প্রাণী খেয়েই

বেঁচে থাকে। সূর্য না থাকলে বৃষ্টি হ'ত না। সূর্যের তাপেই জল বাষ্পে পরিণত হয় এবং জলীয় বাষ্প থেকে আবার বৃষ্টি হয়। সূর্যের তাপ না পেলে ঠাণ্ডায় বাতাস জমে যেত, পৃথিবী জমে কঠিন হ'ত। পৃথিবীতে যে সব শক্তি রয়েছে, সূর্য তাদেরও উৎস। কয়লা, পেট্রোল, কেরোসিন প্রভৃতির মধ্যেও জমা আছে সূর্যের প্রচণ্ড শক্তি। এই সব শক্তিই আবার নানাভাবে রূপান্তরিত হয়ে আমাদের কাজে লাগছে।

চন্দ্র বা চাঁদ

তোমরা আগেই পড়েছ, চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ—পৃথিবীর সন্তান। পৃথিবীর আবর্তনের ফলে একসময় তার দেহ থেকে খানিকটা অংশ ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল। বেরিয়ে গিয়েই সে ঘুরতে শুরু করেছিল পৃথিবীর চারদিকে। আজও সে ঘোরার বিরাম নেই। সেই অংশটিই আমাদের চাঁদ। পৃথিবীর মতই চাঁদও গোলাকার, কিন্তু পৃথিবীর চেয়ে সে অনেক ছোট—পৃথিবীর ৫০ ভাগের প্রায় এক ভাগ মাত্র।

সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে চাঁদই আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ; সে-ই আছে অমাদের সবচেয়ে কাছে—মাত্র ২ লক্ষ ৪০ হাজার মাইল দূরে। যেখানে কোটি কোটি মাইলের ব্যাপার, এই দূরত্বটা সেখানে মোটেই বেশী নয়। ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে সেই রেলগাড়িখানি যদি পৃথিবী থেকে চাঁদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়, তাহলে চাঁদে পৌঁছতে তার সময় লাগবে প্রায় ১০ মাস। অথচ সূর্যে পৌঁছতে তার লাগবে ৩৫০ বছর।

চাঁদকে পৃথিবী থেকে ভারী সুন্দর দেখায়; কিন্তু চাঁদ আসলে মোটেই সুন্দর নয়। চাঁদে জীবনের চিহ্নমাত্র নেই—না আছে জীবজন্তু, না আছে গাছপালা। জল বা

চাঁদের কলঙ্ক
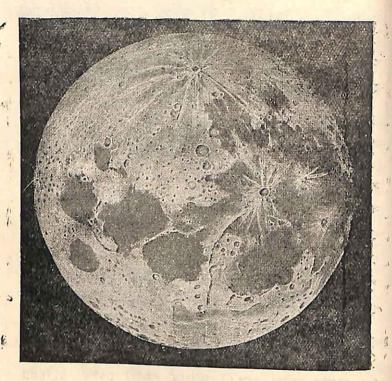
বাতাস কিছুই নেই সেখানে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড়-পর্বত আর সুগভীর সব গহ্বর রয়েছে চাঁদের দেশে। এইসব গহ্বর ও পাহাড়-পর্বতের ছায়ায় সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না। পৃথিবী থেকে সে-সব জায়গাকে তাই

কালো দেখায়। সেগুলিকে আমরা বাল **চাঁদের কলঙ্ক।** তোমরা 'চাঁদের মা বুড়ি'র রূপকথা শুনেছ নিশ্চয়ই। এই কলঙ্কগুলিকেই পৃথিবী থেকে বুড়ির মত মনে হয়। তোমরা আগেই পড়েছ, চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই, সূর্যের আলোকেই সে আলোকিত হয়।

চাঁদের কলা—তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ, আকাশে প্রতি রাতে চাঁদের আকার বদলায়। ১৫ দিন ধরে তার আকার কেবলই বাড়তে থাকে, পরের ১৫ দিন ধরে আবার কেবলই কমতে থাকে। কিন্তু সত্যিই কি চাঁদের এরকম কোন হ্রাস-বৃদ্ধি আছে? না। চাঁদের সূর্যালোকিত অর্ধাংশের যে অংশটুকু পৃথিবীর দিকে থাকে, সেইটুকুই কেবল আমরা দেখতে পাই, বাকিটুকু থাকে দৃষ্টির বাইরে। পৃথিবী থেকে দেখা আলোকিত অংশটুকুও আবার সব দিন এক রকম থাকে না; কখনও বাড়ে, কখনও কমে। কোন দিন আলোকিত সম্পূর্ণ অর্ধাংশ দেখা যায়, কোন দিন আবার কিছুই দেখা যায় না। আকাশে চাঁদের আলোকিত অংশের এই বিভিন্ন আকারকে বলে **চাঁদের কলা।** কলার এই হ্রাস-বৃদ্ধি কেন হয়, বলতে পার?

চাঁদ ঘুরছে পৃথিবীর চারপাশে; ঘুরতে ঘুরতে চাঁদ যখন সূর্য ও পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে এসে পৌঁছায়, তখন তার আলোকিত দিকটা থাকে পৃথিবীর ঠিক বিপরীত দিকে। তাই চাঁদকে তখন আমরা আকাশে দেখতে পাই না। এই অবস্থাকে বলে **অমাবস্যা।** তারপর চাঁদ আবার একটু একটু সরতে থাকে পশ্চিম থেকে পুবে। অমাবস্যার পরে তাই চাঁদকে

পশ্চিমাকাশে দেখা যায় খুব সরু একটি ফালির মত। তারপর প্রতিদিন তার আকার বাড়তে থাকে। আকার বাড়তে থাকার কারণ, চাঁদ সরে আসার ফলে ক্রমশঃ তার আলোকিত দিকের বেশী বেশী অংশ আমাদের দৃষ্টিপথে আসতে থাকে।
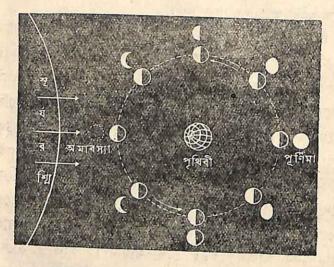
চন্দ্রের কলা, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা

তারপর ১৫ দিনের দিন তাকে দেখতে হয় একখানা থালার মত। সে পুব আকাশে উদয় হয়। এই দিনকে বলা হয় পূর্ণিমা। পূর্ণিমার চাঁদ সূর্যের বিপরীত দিকে চলে আসে বলেই তার সম্পূর্ণ আলোকিত অর্ধাংশ আমাদের সামনে পড়ে। পূর্ণিমার পর থেকেই চাঁদ সরে যেতে থাকে, তার আলোকিত অর্ধাংশও কমতে থাকে একটু একটু করে। এইরূপ কমতে কমতে চাঁদ অবশেষে অমাবস্যার অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়।

চন্দ্রের কাজ—চাঁদ যে কেবল আমাদের জ্যোৎস্নাই দেয়, তাই নয়; চাঁদের জন্যই প্রধানতঃ সমুদ্রে ও নদীতে জোয়ার-ভাঁটা খেলে।

প্রতি জিনিসই তার নিজের দিকে অন্য জিনিসকে আকর্ষণ করে। সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী—প্রত্যেকেরই নিজস্ব এই আকর্ষণী শক্তি আছে। প্রত্যেকেই অপরকে নিজের দিকে টানছে। কিন্তু সূর্য আছে বহু দূরে। পৃথিবীর উপর তার আকর্ষণ তাই তত বেশী প্রবল নয়। কিন্তু চাঁদ রয়েছে পৃথিবীর অনেক কাছে, পৃথিবীর উপর তার আকর্ষণও তাই সবচেয়ে বেশী। মাটি, গাছপালা, দালানকোঠা প্রভৃতি শক্ত জিনিসের উপর এই আকর্ষণ অনুভব করা খুবই কঠিন। কিন্তু জল তরল পদার্থ; তাই জলের উপর এই আকর্ষণ সহজেই ধরা পড়ে।

চাঁদের টানে সমুদ্রের জল উপর দিকে ফুলে ওঠে, সমুদ্রে তখন জোয়ার আসে। টান যখন কমে, জলও তখন নেমে যায়, সমুদ্রে তখন ভাঁটা পড়ে। সমুদ্রের সঙ্গে নদী-নালার যোগ আছে। তাই সঙ্গে সঙ্গে নদী-নালাতেও জোয়ার-ভাঁটা খেলে। জোয়ার-ভাঁটা হয় রোজই, তবে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে সবচেয়ে বেশী হয়।

জোয়ার-ভাঁটার ফলে আমাদের উপকারও হয় যথেষ্ট। জোয়ারে সমুদ্রের জল নদীপথে দেশের ভিতরে নীচু অঞ্চলে প্রবেশ করে, ভাঁটার সময় সে-সব জায়গার অনেক ময়লা-আবর্জনা তাই ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যায়। নদীর জলও অনেকটা পরিষ্কার থাকে এর ফলে। ভাঁটার টানে নদীর

আবর্জনা অধিকাংশই সমুদ্রের দিকে চলে যায়। জোয়ার-ভাঁটার জন্য নদীর খাত গভীর থাকে। নদীখাতে যে-সব পলিমাটি জমে, ভাঁটার টানে তার বেশীর ভাগই সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। তার ফলে নদী নাব্য থাকায় চলাচল ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে সুবিধা হয়। জোয়ার-ভাঁটা আছে বলেই দেশ-গঠনে সাহায্য হয়। মোহনার নিকট সমুদ্র-জলে পলিমাটি মিশান থাকে। তাই তার জল ঘোলা দেখায়। জোয়ারের সময় এই জল দেশের নীচু অঞ্চলে প্রবেশ করে, পলিমাটি তখন থিতিয়ে পড়ে মাটিতে। ভাঁটার সময় জল বেরিয়ে গেলেও, পলিমাটি অনেকটা থেকে যায়। তার ফলে ধীরে ধীরে নীচু জমি উঁচু হয়, দেশ গঠিত হয়, সে স্থান মানুষের বসবাসের যোগ্য হয়।

এইভাবে চাঁদ আমাদের অনেক উপকার করে।

সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ

আকাশের বুকে **সূর্যগ্রহণ** ও **চন্দ্রগ্রহণ** এক বিচিত্র ব্যাপার। 'গ্রহণ' সম্পর্কে বিভিন্ন দেশে নানারকম কাহিনী প্রচলিত আছে। লোকের মনে বদ্ধমূল আছে নানারকম বিশ্বাস ও সংস্কার। বিজ্ঞানের তথ্য না জানায় ভারতের কোন কোন লোক আজও হয়ত মনে করে, 'রাহু' নামে এক ভয়ঙ্কর দৈত্য কিছুক্ষণের জন্য সূর্য বা চন্দ্রকে গিলে ফেলে বলেই 'গ্রহণ' হয়। চীন দেশের কোন কোন লোক হয়ত আজও বিশ্বাস করে, 'ড্রাগন' নামে ভয়ঙ্কর এক অগ্নিভোজী জানোয়ার সূর্য বা চন্দ্রকে খেয়ে ফেলে।

বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, এসব বিশ্বাস বা সংস্কারের মূলে কোনই সত্য নেই। চাঁদ যখন সূর্যের আলোককে আড়াল

করে, তখন হয় সূর্যগ্রহণ। আর পৃথিবী যখন সূর্যকে আড়াল করে, তখন হয় চন্দ্রগ্রহণ।

সূর্যগ্রহণ—সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে আর পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে চাঁদ। এইভাবে ঘুরপাক খেতে খেতে চাঁদ যখন সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে এসে যায়, তখন তার ছায়া পড়ে পৃথিবীর বুকে। পৃথিবীর যে অংশে এই ছায়া পড়ে, সেই
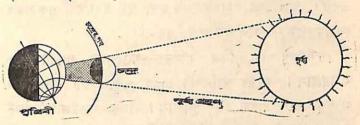
অংশের লোক সূর্যকে তখন আর দেখতে পায় না ; সূর্য ঢাকা পড়ে। তখন হয় সূর্যগ্রহণ।
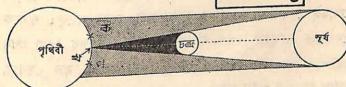
ক ও গ—এইস্থান থেকে আংশিক সূর্যগ্রহণ দেখা যায়।
(১নং চিত্র দ্রষ্টব্য।)
খ—এইস্থান থেকে পূর্ণগ্রহণ দেখা যায়।

এর আগে আমরা দেখেছি, চাঁদ যখন পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে আসে, তখনই অমাবস্যা হয়। আর সূর্যগ্রহণ হয় এই

অমাবস্যা তিথিতেই। কিন্তু সব অমাবস্যাতেই সূর্যগ্রহণ হয় না। সূর্য, চন্দ্র আর পৃথিবী যদি একই সরল রেখায় থাকে, তবে চন্দ্র আড়াল করে সূর্যকে। পৃথিবীর যে অংশ থেকে সূর্য এইভাবে আড়ালে পড়ে, সেখান থেকে সূর্যকে তখন আর দেখা যায় না। কিন্তু চন্দ্র এবং পৃথিবীর কক্ষপথ পরস্পর কোনাকুনিভাবে আছে, এবং পরস্পরের দিকে হেলে আছে একটু। তাই সব অমাবস্যাতেই চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী এক সরল রেখায় পড়ে না, ফলে সূর্যগ্রহণও হয় না।

সূর্যগ্রহণ হয় তিন ধরনের—**খণ্ডগ্রাস**, **পূর্ণগ্রাস** ও **বলয়গ্রাস**। সূর্যের খানিকটা ঢাকা পড়লে হয় **খণ্ডগ্রাস**। সবটুকু ঢেকে গেলে হয় **পূর্ণগ্রাস**। কিন্তু বলয়গ্রাস একটু অন্য ধরনের। সূর্যের দিকে তাকিয়ে একটা পয়সা যদি একেবারে চোখের সামনে ধর, তাহলে দেখবে ছোট্ট পয়সাটাই অত বড় সূর্যকে ঢেকে ফেলেছে। এইবার পয়সাটা ধীরে ধীরে দূরে সরিয়ে নিতে থাক। দেখবে, সূর্যের বাইরের বেড়টা ক্রমেই দেখা যাচ্ছে, কিন্তু মাঝখানটা ঢাকা আছে; সূর্যকে দেখাচ্ছে অনেকটা বলয় বা বালার মত। চাঁদের ছায়া যখন এমন ভাবে পড়ে যে, সূর্যকে ঐরকম বলয়ের মত দেখায়, তখন বলা হয় **বলয়গ্রাস**।

চন্দ্রগ্রহণ—তোমরা জান, চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই। চাঁদ আলোকিত হয় সূর্যের আলোকে। তাই, নিজ কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবী যখন সূর্য ও চন্দ্রের মাঝখানে আসে, তখন তার ছায়া চন্দ্রকে ঢেকে ফেলে, চন্দ্রকে তখন আর দেখা

যায় না। এই সময় হয় চন্দ্রগ্রহণ পূর্ণিমা তিথিতেই চন্দ্রগ্রহণ হয়, কিন্তু সব পূর্ণিমাতেই হয় না। যে পূর্ণিমায় সূর্য,
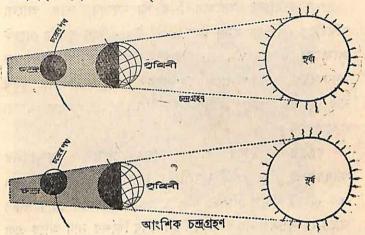
আংশিক চন্দ্রগ্রহণ

পৃথিবী এবং চন্দ্র এক সরল রেখায় থাকে, সেই সময় হয় চন্দ্রগ্রহণ। চন্দ্রের **পূর্ণগ্রাস** ও **খণ্ডগ্রাস** হয় ; বলয়গ্রাস হয় না, কারণ চন্দ্র অনেক ছোট।

নক্ষত্র

তোমরা আগেই পড়েছ, রাত্রির আকাশে যে অসংখ্য আলোর বিন্দুকে জ্বলতে দেখা যায়, তাদের মধ্যে কয়েকটি মাত্র গ্রহ, বাকিগুলি সবই নক্ষত্র, এবং তাদের মধ্যে সূর্যও একটি নক্ষত্র। নক্ষত্রদের নিজস্ব আলো আছে।

নক্ষত্রগুলির মধ্যে অনেকেই সূর্যের চেয়ে বহুগুণ বড়। বহু দূরে আছে বলে তাদের এত ছোট দেখায়। এই বহু দূর মানে যে কতদূর, তা তোমরা ধারণাও করতে পারবে না।

একটু হিসাব করা যাক। তার আগে মনে রেখ, আলো এক সেকেণ্ডে যায় ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল।

সূর্য আমাদের সবচেয়ে নিকটতম নক্ষত্র। তার আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে সময় নেয় ৮ মিনিট। কিন্তু সূর্যের পরেই আমাদের নিকটতম নক্ষত্রের আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে কত সময় লাগে, জান? সাড়ে চার বছর! কাছের নক্ষত্রের দূরত্ব যদি এই হয়, তাহলে অন্যান্য নক্ষত্রগুলি কোথায় আছে, ধারণা করতে পার?

রাত্রির আকাশে লক্ষ্য করলে দেখবে, নক্ষত্রগুলির অধিকাংশই এক একটি **মণ্ডলী** বা **মণ্ডল** রচনা করে আছে। এক একটা মণ্ডলে পাঁচটা, সাতটা, দশটা বা তারও বেশী নক্ষত্র থাকে। মণ্ডলগুলির প্রত্যেকটির বিশেষ বিশেষ নাম আছে এবং প্রায় সব মণ্ডলেই আছে উজ্জ্বল বড় নক্ষত্র। লক্ষ্য করলে দেখবে, একটি নক্ষত্র বাদে আর কোন নক্ষত্রই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই, প্রতি রাত্রেই তারা স্থান পরিবর্তন করে।

ধ্রুবতারা—যে নক্ষত্রটি মোটেই স্থান পরিবর্তন করে না, সব সময় আকাশের এক জায়গায় থাকে, তার নাম **ধ্রুবতারা।** ধ্রুবতারা মাঝারি রকমের উজ্জ্বল, এবং আকাশে উত্তর দিকে তাকে দেখতে পাবে। অন্ধকার রাত্রিতে দিক হারিয়ে ফেললে ধ্রুবতারার সাহায্যে দিক ঠিক করা যায়। সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাহায্যে ধ্রুবতারাকে চিনে রাখবার বেশ সুবিধাও রয়েছে।

সপ্তর্ষিমণ্ডল—চৈত্র-বৈশাখ মাসে সন্ধ্যার আকাশে উত্তর দিকে দেখা যায় সাতটি নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে। মনে মনে যদি

একটি সরল রেখার দ্বারা তাদের পরস্পরকে যোগ করে দাও, দেখবে তাদের আকার হয়েছে একটি জিজ্ঞাসার চিহ্নের মত। এর নাম সপ্তর্ষিমণ্ডল। সপ্তর্ষিমণ্ডলের তারাগুলির নাম যথাক্রমে
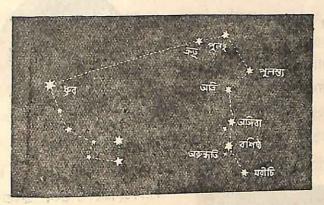
—ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও মরীচি। এগুলি সমস্তই রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি আমাদের পুরাণে উল্লিখিত ঋষিদের নাম। ভালভাবে লক্ষ্য করলে বশিষ্ঠের কাছেই আর একটি ছোট তারা দেখতে পাবে। তার নাম অরুন্ধতী। পুরাণ থেকে জানা যায়, অরুন্ধতী বশিষ্ঠের স্ত্রী ছিলেন।

এইবার পুলহ ও ক্রতুকে একটা কাল্পনিক রেখার দ্বারা যোগ করে রেখাটিকে উত্তর দিকে বাড়িয়ে দাও, দেখবে রেখাটি ধ্রুবতারার উপর দিয়ে যাবে।

আমাদের দেশে ভাদ্র থেকে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত সপ্তর্ষি-মণ্ডলকে আকাশে দেখা যায় না। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাস থেকে সপ্তর্ষিমণ্ডল ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে নামতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত আকাশের এত নীচে নেমে যায় যে, আর দেখা যায় না।

ক্যাসিওপিয়া—ধ্রুবতারার যেদিকে সপ্তর্ষিমণ্ডল, ঠিক তার উল্টো দিকে পাঁচটি তারার এক মণ্ডল দেখতে পাবে। এর নাম ক্যাসিওপিয়া মণ্ডল। কাল্পনিক রেখার দ্বারা যোগকরলে ক্যাসিওপিয়াকে দেখতে হবে অনেকটা ইংরাজী M বা W অক্ষরের মত। কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে সপ্তর্ষিমণ্ডল যখণ আকাশ থেকে অদৃশ্য হয়, ক্যাসিওপিয়াকে তখন ধ্রুবতারার কাছেই একটু উপরে দেখা যায়। ক্যাসিওপিয়ার সাহায্যে ধ্রুবতারাকে চিনতে সে সময় তাই কোন অসুবিধাই হয় না।

কালপুরুষ

কালপুরুষ—সাধারণতঃ পৌষ-মাঘ মাসে ধ্রুবতারা থেকে দূরে আকাশের পুবদিকে অনেকগুলি তারার এক মণ্ডল দেখা যায়। তারাগুলিকে যদি কাল্পনিক রেখা দ্বারা যোগ কর, তাহলে দেখতে হবে একজন সৈনিক-পুরুষের মত। দেখবে, সৈনিকের কোমরে কোমরবন্ধ, কোমরবন্ধে যেন তলোয়ার ঝুলছে, আর সৈনিকের

হাতে রয়েছে ধনুর্বাণ। মণ্ডলটির নামকরণও তাই হয়েছে **কালপুরুষ**।

সন্ধ্যাতারা—বছরের কয়েক সপ্তাহ ধরে সূর্য ডুবে যাওয়ার ঠিক পরেই সন্ধ্যার পশ্চিম আকাশে খুব উজ্জ্বল একটি বড় নক্ষত্রকে জ্বলজ্বল করতে দেখা যায়। এর নাম সন্ধ্যাতারা। আসলে এটি কিন্তু তারা নয়। তারার আলো মিট্‌মিট্‌ করে, সন্ধ্যাতারার আলো কিন্তু স্থির। এটি আসলে **শুক্রগ্রহ**। চন্দ্রকে বাদ দিলে শুক্রগ্রহই আমাদের সবচেয়ে নিকটে আছে। তাকে বছরের কয়েক সপ্তাহ ধরে শেষ রাতে পুব আকাশেও দেখা যায়। তখন তাকে বলে শুকতারা।

ছায়াপথ—অন্ধকার রাতে সাধারণতঃ শরৎকালে দেখা যায় দুধের মত সাদা, চওড়া একটি পথ আকাশের একদিক থেকে আর একদিকে চলে গেছে। অনেক সময় তাকে সাদা মেঘ বলেও ভুল হয়। কিন্তু এটা মেঘ নয়। ছোট ছোট অসংখ্য তারা মিলে সৃষ্টি করেছে এই আলোর পথ। একে বলে ছায়াপথ। ছায়াপথের ভিতর আছে অসংখ্য তারকা; সেইগুলি আকাশের অন্য তারাদের চেয়েও পৃথিবী থেকে অনেক দূরে আছে।

আবহাওয়া-চিত্র

বাংলাদেশের জীবনে ছয়টি ঋতু বিভিন্ন রূপ নিয়ে হাজির হয়। ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে আবহাওয়াও হয় ভিন্ন ভিন্ন। এমনকি আবহাওয়ার পরিবর্তন হয় প্রতিদিনই। কোন একটি দিনে গড় তাপ কত, বাতাসের বেগ কি রকম, বাতাস কোন্ দিক থেকে বইছে, বাতাসের চাপের পরিমাণ কত, বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আর্দ্রতা কতখানি, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কি—এই সমস্ত হিসাবকে এককথায় সেদিনকার আবহাওয়া বলে।

তাপমান যন্ত্র—থার্মোমিটার বা তাপমান যন্ত্র দিয়ে দিনের তাপ স্থির করা হয়। থার্মোমিটার তোমরা সবাই দেখেছ। একটি সরু কাঁচের নলের নীচেটা পারায় ভর্তি থাকে। তাপ বাড়লেই পারা উপরে উঠতে থাকে, তাপ কমলে পারা নীচে নামতে থাকে। তার ফলে বোঝা যায়, কোন্ জায়গার তাপ কতখানি। বরফের মধ্যে রাখলে পারার সূত্রটি যেখানে নেমে আসে, তাকে ৩২° ডিগ্রী ধরা হয়। আর ফুটন্ত জলে রাখলে পারা যেখানে উঠে যায়, তাকে ধরা হয় ২১২° ডিগ্রী। তার মাঝখানে ১৮০টি ভাগের প্রত্যেক ভাগকে এক ডিগ্রী বলা হয়। আবহাওয়া পরিমাপের জন্যে এই ধরনের থার্মোমিটার ব্যবহৃত হয়। একে বলে ফারেনহাইট থার্মোমিটার।

চাপমান যন্ত্র—বাতাসের চাপ পরিমাপ করা হয় চাপমান বা ব্যারোমিটার যন্ত্র দিয়ে। একটি একমুখ-বন্ধ দু হাত লম্বা কাঁচের নল পারদ দিয়ে সম্পূর্ণ ভর্তি করে আঙ্গুল দিয়ে খোলা মুখ বন্ধ কর। তারপর সেই মুখটা একটি পারদের পাত্রে

ডুবিয়ে দাও। দেখবে, নলের পারার উচ্চতা নেমে দাঁড়াবে প্রায় ৩০ ইঞ্চি। বায়ুচাপের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পারার উচ্চতা বাড়ে ও কমে। নানা কারণে বায়ুচাপের কমবেশি হয়। বাতাস গরম হলে বা বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়লেও
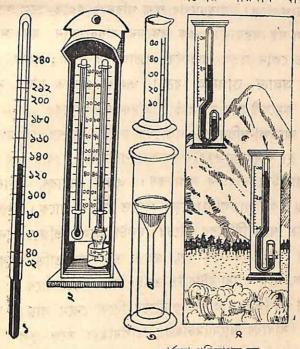
১। তাপমান যন্ত্র ২। আর্দ্রতা-পরিমাপক যন্ত্র
৩। বৃষ্টিমান যন্ত্র ৪। চাপমান যন্ত্র

বায়ুচাপ কমে। কোন জায়গায় নির্দিষ্ট বায়ুচাপ কমে গেলে বুঝতে হবে, বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়েছে অথবা বাতাস গরম হয়েছে। জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়লে বা বাতাস গরম হলে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। আবার, পৃথিবী

ছেড়ে যত উপরে ওঠা যায়, বায়ুচাপও ততই কমতে থাকে। ছবির ৪নং চাপমান যন্ত্রটিতে দেখ, নীচে সমুদ্রতীরের বায়ুচাপ পাহাড়ের উপরকার বায়ুচাপের চেয়ে বেশী। এ যন্ত্রে অপেক্ষাকৃত ছোট বাঁকান অংশের ভিতরকার পারদের উপরই বায়ুচাপ পড়ে। বায়ুচাপের সূক্ষ্ম পরিমাপ করতে হলে আরও জটিল যন্ত্র দরকার। এক রকমের বায়ুচাপমান যন্ত্র আছে, যাতে কোন তরল পদার্থের প্রয়োজন হয় না; এদের বলা হয় **অনাদ্র তাপমান** যন্ত্র। এগুলি দেখতে ঘড়ির মত। চাপ কমবেশী হলে যন্ত্রের কাঁটা এদিক ওদিক সরে।

আর্দ্রতা-পরিমাপ—বাতাসের জলীয় অংশের পরিমাণকে বলা হয় বায়ুর আর্দ্রতা। আর্দ্রতা পরিমাপ করবার জন্য দুটি থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয়। একটি সাধারণ, অপরটির গায়ে একটি পাতলা কাপড়ের পলতে জড়ান থাকে। পলতে সমেত থার্মোমিটারের নীচের দিকটা জলে ভিজিয়ে নেওয়া হয়। বায়ু যত শুষ্ক হয়, জলও তত তাড়াতাড়ি শুকোতে থাকে, আর থার্মোমিটারটিও ততই ঠাণ্ডা হতে থাকে। তার ফলে এর ভিতরকার পারাও নীচের দিকে নেমে যায়। তখন অন্য সাধারণ থার্মোমিটারটির তাপমাত্রার সঙ্গে তুলনা করে বাতাসের আর্দ্রতা স্থির করা হয়।

বৃষ্টিমান যন্ত্র—এই যন্ত্র দিয়ে বৃষ্টির পরিমাপ করা যায়। যন্ত্রটিতে একটি ফানেল আছে, আর আছে নলের মত দুটি পাত্র—একটি বড়, অন্যটি ছোট। বড় পাত্রটির এবং ফানেলের মুখের ব্যাস সমান। বৃষ্টির সময় বড় পাত্রটির মধ্যে ছোট পাত্রটি রেখে

তার মুখে ফানেলটি বসিয়ে দিতে হয়। তার ফলে, বড় পাত্রটির মধ্যে যে বৃষ্টি পড়ে, তা একটুও নষ্ট না হয়ে ফানেলের ভিতর দিয়ে ছোট পাত্রে গিয়ে জমা হয়। এই জল তারপর ঢালা হয় আর একটি পাত্রে। তার গায় ইঞ্চি-দাগ কাটা থাকে। জল যে কয় ইঞ্চি পর্যন্ত ওঠে, বুঝতে হবে সেদিন সেই কয় ইঞ্চি বৃষ্টি হয়েছে। নির্ভুল হিসাব পেতে হলে ফানেলটির এবং ছোট পাত্রটির ক্ষেত্রফলও জানা দরকার। সেজন্য কিছু হিসাবেরও দরকার হয়।

এইসব যন্ত্রের সাহায্যে আবহাওয়া ঠিকমত জেনে তোমরা নিজেরা আবহাওয়া-চিত্র তৈরি করতে পার। সেই সঙ্গে

স্থানের নাম··· তারিখ··· সময়—২৪ ঘণ্টা

আর্দ্রতা		বাতাসের গতি ও দিক	আকাশের অবস্থা	তাপ		সারাদিনে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ
সর্বাধিক	সর্বনিম্ন			সর্বাধিক	সর্বনিম্ন	

আকাশের কি রকম অবস্থা ছিল, বায়ুর গতি কোন্ দিকে ছিল—সে সবও আবহাওয়া-চিত্রে থাকবে। ঋতু হিসাবে ২৪ ঘণ্টা অন্তর আবহাওয়া-চিত্রের ঘর পূরণ করবে। এই চিত্র কি ভাবে তৈরি করবে, তার একটা নমুনা নীচে দেওয়া হল।

অনুশীলনী

১। মেঘ হয় কিভাবে? কয় রকমের মেঘ হয়? বৃষ্টি হয় কোন্ মেঘে?

২। গ্রহ এবং উপগ্রহ কাকে বলে? গ্রহগুলির নাম কর। সূর্য সম্বন্ধে কি জান, বল। সূর্য আমাদের কি উপকার করে?

৩। চাঁদের কলা কাকে বলে এবং কেন হয়?

৪। সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ কেন হয়?

৫। ধ্রুবতারা কিভাবে সহজে চেনা যায়? বিভিন্ন নক্ষত্রমণ্ডল সম্বন্ধে যা জান, বল। সন্ধ্যাতারা ও শুকতারা কাকে বলে? ছায়াপথ কাকে বলে?

৬। আবহাওয়া ঠিকমত জানতে হলে কি কি যন্ত্রের দরকার? বৃষ্টিমান যন্ত্র তৈরি করা হয় কি ভাবে?

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিভিন্ন প্রকারের মাটি ও তার উপাদান

মাটির সৃষ্টি হয়েছে প্রধানতঃ পাথর থেকে। হাজার হাজার বছর ধরে বাতাস, বৃষ্টি, তাপ, নদীস্রোত প্রভৃতির ফলে পাথর ক্রমশঃ গুঁড়ো হয়ে মাটিতে পরিণত হয়। জীব-জন্তুর দেহ এবং গাছপালাও আস্তে আস্তে পচে গিয়ে রূপান্তরিত হয় মাটিতে। পাথর ছাড়াও তাই মাটির মধ্যে আছে নানা জৈব পদার্থ আর অনেক রকম ধাতব ও রাসায়নিক জিনিস। এসব জিনিস ছাড়াও মাটিতে আছে জীবাণু, জল আর বাতাস।

মাটির প্রকারভেদ

সব মাটি কিন্তু একরকম নয়। ভিন্ন ভিন্ন মাটি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। প্রত্যেক মাটির প্রকৃতি ভিন্ন, তার রঙও ভিন্ন। আমাদের দেশে মাটি প্রধানতঃ তিন রকমের—**এঁটেল মাটি, বেলে মাটি** আর **দোআঁশ মাটি**। এদের মিশ্রণে আবার এঁটেল-দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ প্রভৃতি নানা জাতের মাটি হয়। এসব ছাড়াও আরো অনেক রকমের মাটি দেখা যায়; যেমন—**চুনা মাটি, লাল মাটি, কালো মাটি** প্রভৃতি।

এঁটেল মাটি তৈরী হয়েছে কাঁদা ও পাথর থেকে। এ মাটিতে বালির ভাগ খুব কম থাকে; অধিকাংশই কাদা। এ মাটি জল দিয়ে সহজেই গোলা যায়, আবার শুকিয়ে গেলে

পাথরের মত শক্ত হয়। ধান প্রভৃতি ফসল এঁটেল মাটিতে ভাল জন্মে।

বেলে মাটির নাম থেকেই বোঝা যায়, বেলে পাথর থেকে তার জন্ম। এ মাটিতে বালির ভাগ খুব বেশী—শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ; কাদার ভাগ খুবই সামান্য। এই ধরনের মাটি দেখা যায় সাধারণতঃ নদীর চরে। এ মাটিতে তরমুজ, পটল প্রভৃতি ফসল ভাল জন্মে।

দোআঁশ মাটিতে বেলে মাটি আর এঁটেল মাটি আধাআধি মত থাকে। এ মাটি খুব উর্বর। এতে খুব ভাল ফসল হয়। যে দোআঁশ মাটিতে বালির ভাগ বেশী, তাকে বেলে-দোআঁশ এবং যাতে কাদার ভাগ বেশী, তাকে এঁটেল-দোআঁশ বলে।

চুনা মাটি চুনা পাথর থেকে উৎপন্ন হয়। চুন জাতীয় পদার্থ শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ থাকে এর মধ্যে। চুনা মাটিতেও ভাল চাষ-আবাদ হয়।

লাল মাটিতে লোহার পরিমাণ বেশী থাকে; সেজন্যই মাটির রং লাল হয়। ধান চাষ এই মাটিতে মন্দ হয় না।

কালো মাটি—অগ্ন্যুৎপাতের ফলে আগ্নেয়গিরি থেকে যে লাভা-স্রোত প্রবাহিত হয়, ধীরে ধীরে তা জমাট বাঁধে। হাজার হাজার বছর ধরে সেই জমাট-বাঁধা লাভা গুঁড়ো হয়ে সৃষ্ট হয় **কালো মাটি**। এই মাটিতে প্রচুর পরিমাণে ধাতব পদার্থ থাকে। এ মাটি খুব উর্বর, তুলোজাতীয় ফসলের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী। দক্ষিণ ভারতের এক বিরাট অঞ্চলের মাটি কালো।

মাটির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি

চাষ-আবাদের ফলে মাটিতে নানারকম শস্য, ফল, শাক-সব্‌জি প্রভৃতির গাছ জন্মে। সেই গাছ মাটি থেকে তার খাদ্য-উপাদান টেনে নিয়ে বেঁচে থাকে ও বড় হয়। তার ফলে মাটির মধ্যে যে খাদ্য-উপাদান থাকে, ক্রমশঃ তা কমতে থাকে। গাছের বেঁচে থাকার ও বৃদ্ধির জন্য মাটির মধ্যে এই যে খাদ্য-উপাদান থাকে, তাকে বলে মাটির **উর্বরা-শক্তি**।

কয়েক বছর চাষের পর অনেকেই জমির উর্বরা-শক্তি ফিরিয়ে আনার জন্য জমি আবাদ না করে বছর খানেক ফেলে রাখেন। এই প্রথাকে বলে জমির 'বিশ্রাম'। অনেকে মাটির উপাদান বুঝে একই ক্ষেতে পর্যায়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন ফসলের চাষ করে থাকেন। এতেও জমির উর্বরা-শক্তি অনেকটা রক্ষা পায়। অনেকে জমিতে এমন গভীরভাবে লাঙল দেন, যাতে নাচের মাটি উপরে উঠে আসে এবং উপরের মাটি নীচে গিয়ে বিশ্রাম পায়।

সার—এ ছাড়া জমির হারানো উর্বরা-শক্তি ফিরিয়ে আনার জন্য যে বিশেষ পদার্থ মাটির সঙ্গে মিশান হয়, তার নাম সার। সার মিশানোর ফলে জমির হৃত উপাদানের পূরণ হয় ; ফলে উর্বরা-শক্তি বাড়ে। সার দু' রকমের—সাধারণ সার ও রাসায়নিক সার।

সাধারণ সার—(১) গোবর ও গোমূত্র : এই সার সবচেয়ে সস্তা ও সহজলভ্য। পাড়াগাঁয়ে অনেকেরই বাড়িতে গরু থাকে। গোয়ালের গোবর আর গোমূত্র যদি একটা

বিশেষ জায়গায় পচান হয়, আর তার সঙ্গে যদি কিছু পাতা মিশিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তা থেকে চমৎকার সার তৈরী হয়। চাষের আগে এই সার জমিতে মিশিয়ে দিলে জমি বীজ বপনের জন্য তৈরী হয়।

অনেকে শুধু গোমূত্র প্রায় ২০ গুণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে জমিতে ছড়িয়ে দেন। তাতেও বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়।

(২) পচাপাতা-আবর্জনা ঃ বড় বড় গাছের পাতা ও ছোট ছোট ডালপালা একটি গর্তের মধ্যে রেখে উপর থেকে মাটি চাপা দিলে কয়েক দিনের মধ্যেই তা পচে যায়। তখন তা ভাল সার হিসাবে জমিতে ব্যবহার করা হয়। গাছ একটু বড় না হলে এই সার বিশেষ ব্যবহারোপযোগী হয় না।

(৩) বিষ্ঠা ঃ জন্তু-জানোয়ারের বিষ্ঠা সার হিসাবে খুব ভাল। মানুষের বিষ্ঠা থেকে চমৎকার সার তৈরী হয়। গ্রাম থেকে একটু দূরে একটা বড় গর্ত করে যদি এই বিষ্ঠা ফেলা হয় এবং তাতে মাটি চাপা দেওয়া হয়, তাহলে তা কালক্রমে পচে মাটিতে পরিণত হয়। তখন আর তাতে দুর্গন্ধ থাকে না এবং তা সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

(৪) খোল ঃ সরিষা, তিল, নারিকেল, চীনাবাদাম প্রভৃতি থেকে তেল বের করে নেবার পর যে খোল থাকে, সার হিসাবে তা-ও জমিতে খুব ব্যবহার করা হয়। জমিতে বীজ বপনের আগে এই সার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়।

(৫) অন্যান্য সার ঃ অনেক সময় ক্ষেত থেকে ফসল ওঠার পরেই জমিতে মটরজাতীয় গাছ, ধঞ্চে, শণ প্রভৃতির চাষ

করা হয়। তারপর সেই ফসলটি আর ঘরে না তুলে কেটে জমিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে গাছগুলি পচে মাটির সঙ্গে মিশে জমির খুব ভাল সারে পরিণত হয়। একে বলে সবুজ সার। হাড়ের গুঁড়োও একটি ভাল সার।

রাসায়নিক সার—আধুনিক যুগে সাধারণ সার ছাড়াও কারখানায় রাসায়নিক সার তৈরী হয়। অ্যামোনিয়াম সালফেট বা সালফেট অব অ্যামোনিয়া, পটাসিয়াম নাইট্রেট, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, নানা জাতীয় ফসফেট প্রভৃতি এই রাসায়নিক সারের মধ্যে পড়ে। আমাদের দেশে সম্প্রতি সিন্ধ্রীতে রাসায়নিক সার তৈরির এক বিরাট কারখানা স্থাপিত হয়েছে।

সার ব্যবহারের সময় মনে রাখা দরকার, সব জমিতেই এক রকমের সার চলে না। জমির প্রকৃতি বুঝে, তার প্রয়োজনের পরিমাণ বুঝে সার ব্যবহার করতে হয়। সার বেশী হলে জমিতে ভাল ফসল তো হয়ই না, বরং জমি 'জ্বলে' গিয়ে ফসলের বিশেষ ক্ষতি করে।

মাটির ক্ষয়

জমির যা কিছু উর্বরা-শক্তি, তা থাকে তার উপরের স্তরেই। বৃষ্টির সময় এই সারযুক্ত মাটি জলে ধুয়ে জমি থেকে বেরিয়ে যায়। জমি যেখানে ঢালু, সেখানে এইভাবে ক্ষয় হয় বেশী। অতিবৃষ্টি হ'লে ক্ষয়ের পরিমাণ আরও বাড়ে। আবার অনাবৃষ্টি হ'লেও মাটির জল শুকিয়ে ধুলোয় পরিণত হয়; ফলে মাটির কণা বাতাসের সঙ্গে এক জায়গা থেকে অন্য

জায়গায় উড়ে চলে যায়। এই সব কারণে মাটির যে ক্ষতি হয়, তাকে **মাটির ক্ষয়** বলে। অত্যধিক গোচারণের ফলেও গোচারণ ভূমির মাটি ক্ষয় পেতে পারে।

ক্ষয় নিবারণ—বাংলাদেশে বৃষ্টিতেই মাটির ক্ষয় হয় বেশী। সুতরাং জমির চারপাশে যদি এমন ভাবে আল বেঁধে দেওয়া যায় যে, জল সহজে বেরিয়ে যেতে পারবে না, তাহলে উপরের সার-মাটি ধুয়ে যাবার সম্ভাবনা কম থাকে। যেখানে বৃষ্টি কম, যেমন পশ্চিমবাংলার রাঢ়দেশে, সেখানে ক্ষয় নিবারণের জন্য প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, সরস মাটি বাতাসে উড়ে যেতে পারে না। যেখানে গাছপালা কম, সেখানকার মাটি বেশী জল ধরে রাখতে পারে না, তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। সেজন্য শুকনো জায়গায় বড় বড় গাছের বেষ্টনী, অথবা অল্প-জলে বাঁচে এমন ধরনের ঘাস জন্মালে মাটির ক্ষয় বন্ধ হতে পারে। অত্যধিক গোচারণে ঘাসের গোড়া আলগা হয়ে মাটি শুকিয়ে যায়। সুতরাং গোচারণও পরিমিত হওয়া প্রয়োজন। কৃত্রিম সেচের ব্যবস্থা করতে পারলেও খুব ভাল হয়।

অনুশীলনী

১। মাটি কয় প্রকার?

২। সার কয় প্রকার? কয়েকটি সাধারণ ও সহজলভ্য সারের নাম কর। সার ছাড়া আর কি কি ভাবে মাটির উর্বরা শক্তি রক্ষা করা যায়?

৩। মাটির ক্ষয় কাকে বলে ও ক্ষয় নিবারণের উপায় কি?

সপ্তম অধ্যায়

কৃষিক্ষেত্র ও পুকুর পর্যবেক্ষণ

কৃষিক্ষেত্র—গ্রামে যারা থাক, তারা নিশ্চয়ই দেখেছ, ভোর না হতেই কৃষকরা সব দল বেঁধে লাঙল কাঁধে নিয়ে জমি চাষ করার জন্য মাঠে চলেছে। তাদের সামনে চলেছে গরুর পাল। এই সুন্দর দৃশ্য দেখে তখন কল্পনাও করা যায় না যে, মাঠে মাঠে সোনার ফসল ফলানোর জন্য কি হাড়ভাঙা পরিশ্রমই না চাষীকে করতে হয়!

চাষী মাঠে গিয়েই জমিতে লাঙল দেওয়া শুরু করে। বলদে লাঙল টানতে থাকে, চাষী জোরে লাঙলের হালটা চেপে ধরে, যাতে লাঙলের শক্ত ফলাটি মাটির বুক গভীরভাবে চিরে ফেলতে পারে। এইভাবে কয়েকবার লাঙল দেবার পর মই দিয়ে মাটির বড় বড় চাঁইগুলো ভেঙে গুঁড়ো করে দেওয়া হয় এবং জমির উর্বর-শক্তি বাড়ানোর জন্য মাটির সঙ্গে দরকারমত উপযুক্ত সার মিশান হয়। সার ও মাটিকে ভালভাবে মিশিয়ে দেবার জন্য জমিতে আবার লাঙল দেওয়া হয়। তার ফলে মাটি ওলট্-পালট হয়ে নীচের মাটি উপরে ওঠে, আর উপরের মাটি নীচে যায়।

এর পর জমিতে মই দেওয়া হয়, জমি সমান হয়। সমান হলে বীজ বোনা হয়, কিন্তু চাষীর কাজ এখানেই শেষ হয় না।

বীজ থেকে অঙ্কুর বের হ'লে হয়ত দেখা গেল—অঙ্কুর কোথাও ফাঁক ফাঁক, কোথাও বা একসঙ্গে একগাদা জন্মেছে। চাষীকে তখন সেগুলি আবার সমান করে বসাতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে ফসলের আশেপাশে যেসব আগাছা জন্মে, তা-ও তাকে তুলে ফেলতে হয়।

এর পরও কিন্তু চাষীর বিশ্রাম নেই। পাখী, পোকামাকড় প্রভৃতি সেই নতুন চারা নষ্ট করছে কিনা, তার দিকেও সে খুব নজর রাখে। তারপর যখন ফসল পাকে, চাষী তখন ক্ষেত থেকে তা তুলে নিয়ে আসে খামারে।

বীজ বোনার পর থেকেই জমিতে ঠিক মত জল না দিলে ফসল ভাল হয় না। অনেকেই 'ডোঙা'র সাহায্যে আশ-পাশের খাল-নালা পুকুর থেকে জমিতে জল সেচন করে। বেশী জলও কিন্তু আবার ভাল নয়। বৃষ্টির সময় জমি থেকে অতিরিক্ত জল যাতে বেরিয়ে যেতে পারে, সেজন্য জমির চারদিকে ছোট ছোট নালা কেটে দেওয়া দরকার।

পুকুর—জমিতে জল দেওয়ার কথা উঠলেই পুকুরের কথাও না এসে পারে না। ক্ষেতের আশেপাশে যাতে ভাল পুকুর থাকে, সেদিকে বিশেষ নজর রাখা দরকার। কাছাকাছি ভাল পুকুর থাকলে চাষীকে আর মেঘের দিকে চেয়ে ব'সে থাকতে হয় না। বৃষ্টি না হ'লে পুকুর থেকেই জমিতে জল সরবরাহ হয়।

সেজন্য ভাল পুকুরের প্রয়োজন আজ বড় বেশী। গাঁয়ের বেশীর ভাগ পুকুরই দেখা যায়, কচুরিপানা ও শেওলায় ভর্তি।

কোন কোন পুকুরে আবার জলের ভাগ কমতে কমতে পাঁকের ভাগ বেশী হয়ে দাঁড়ায়। ভাল ফসল পাওয়ার জন্য তাই এই সব পুকুরের ঠিকমত সংস্কার হওয়া উচিত। কচুরিপানা ও শেওলার কবল থেকে পুকুরকে মুক্ত করা আজ একান্তই প্রয়োজন। পাঁক ও মাটি তুলে পুকুর নতুন করে কাটিয়ে নিলে খুব গরমেও তার জল শুকিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে না।

তোমরা যারা গ্রামাঞ্চলে থাক, তারা কৃষিক্ষেত্রের আশে পাশে যে সব পুকুর আছে, সেগুলি পর্যবেক্ষণ করবে। লক্ষ্য করবে, কিভাবে সেই সব পুকুর থেকে চাষের ক্ষেতে জলসেচ করা হয়। প্রায়ই দেখবে, ডোঙাকল বা ঐ রকম কোন কায়দায় পুকুরের জল জমিতে তোলা হয়। তারপর জমির উপর দিয়ে নালা কেটে কেটে সেই জল জমির সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হয়, কোথাও বা ইঞ্জিনের পাম্প দ্বারাও জল সেচ করা হয়।

এই সব পুকুর শুধু জমিতে জল সরবরাহ করার কাজেই ব্যবহার করা হয় না। ভাল মাছের চাষও এই সব পুকুরে করা সম্ভব ; এবং প্রায় সব পুকুরেই কিছু না কিছু মাছের চাষ হয়েই থাকে।

অনুশীলনী

১। ফসল বোনার উপযোগী করতে কৃষিক্ষেত্রে কি কি কাজ করা দরকার ?

২। পুকুর কৃষিকাজকে কি ভাবে সাহায্য করে ?

অষ্টম অধ্যায়

বায়ু

বায়ু বা বাতাস এমন একটি জিনিস যা আমরা দেখতে পাই না, অথচ যা না হলে আমাদের এক মুহূর্তও চলে না। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত পৃথিবীটাই বায়ুর এক মহাসমুদ্রে ডুবে আছে। মাছ যেমন জলের মধ্যে ডুবে থাকে, আমরাও তেমনি ডুবে আছি এই বাতাসের মহাসমুদ্রে। কিন্তু অভ্যাস হয়ে যাওয়ায় বাতাসের কথা আমাদের মনেই থাকে না। গায়ে লাগলে শুধু অনুভূতি দিয়ে এর অস্তিত্ব বুঝতে পারি।

বায়ুপ্রবাহ—এই বায়ুসমুদ্র কিন্তু স্থির গতিহীন নয়। আমাদের উপরে, নীচে, চারপাশে—সর্বত্র বায়ু চলাচল করছে। এই বায়ু চলাচলকে বলে বায়ুপ্রবাহ। বায়ুপ্রবাহের পদ্ধতিটি ভারী চমৎকার। লণ্ঠনের খোলা চিমনির উপর যদি কয়েক টুকরো কাগজ ফেলে দাও, তাহলে দেখবে, টুকরোগুলি উপর দিকে উড়ে যাবে। এর কারণ কি, জান? বাতাস গরম হলেই আয়তনে বাড়ে, সুতরাং আরও হালকা হয়। হালকা বায়ু উপর দিকে উঠতে থাকে। চিমনির উপরকার গরম বাতাসও তাই উপরে ওঠার সময় কাগজের টুকরোগুলিকে উপর দিকে ঠেলে দেয়। গরম বাতাস উপরে উঠে গেলে, সে স্থান ফাঁকা থাকে না, আশপাশের ঠাণ্ডা বাতাস তার স্থান পূরণের জন্য ছুটে আসে। ফলে সৃষ্টি হয় বায়ুপ্রবাহের।

সূর্যতাপের ফলে পৃথিবীর উপরিভাগের বাতাস গরম হয়েই এইভাবে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। বাতাস যেদিক থেকে ছুটে আসে, সেই দিক হিসাবে তার নামকরণ হয়; যেমন—দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে এলে তার নাম হয় 'দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ু', উত্তর দিক থেকে এলে তার নাম হয় 'উত্তরে বায়ু', ইত্যাদি।

বাতাসের ধর্ম—আগেই বলেছি, বাতাস দেখা যায় না। শুধু তাই নয়, বাতাসের কোন আকার নেই, আয়তনও নেই। বাতাস যেখানে থাকে, সেখানে সব জায়গা জুড়ে থাকে।

বাতাস সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। একটা ফুটবলকে যখন তোমরা পাম্প কর, তখন তার ভিতর অনেকখানি বাতাস সঙ্কুচিত হয়ে থাকে। বলের মুখ খুলে দিলে সে বাতাস আবার বাইরে এসে প্রসারিত হয়। অন্যান্য জিনিসের মত বাতাসেরও ওজন আছে। উপরে, নীচে ও আশেপাশে সব দিকেই বাতাসের চাপ আছে।

বাতাসের এক নাম গন্ধবহ, কারণ বাতাসই গন্ধ বয়ে নিয়ে যায়। বাতাস শব্দবহও বটে। বাতাস না থাকলে আমরা শব্দ শুনতে পেতাম না।

মুক্ত বায়ুর প্রয়োজন ও উপকারিতা—বাতাস যেমন বিশুদ্ধ হতে পারে, তেমনি নানা রোগজীবাণু, খারাপ গ্যাস প্রভৃতির সংমিশ্রণে সম্পূর্ণ দূষিতও হতে পারে। সেই দূষিত বাতাস গ্রহণ করলে আমাদের শরীরও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাই সর্বদাই বিশুদ্ধ মুক্ত বায়ু গ্রহণ করা উচিত।

বিশুদ্ধ বায়ুর উপাদান—কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন গ্যাস মিলে তৈরী হয়েছে বাতাস। বিশুদ্ধ বাতাসে এই গ্যাস কয়টির পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে। তাদের মধ্যে প্রধান গ্যাস হল দুটি—**অক্সিজেন** আর **নাইট্রোজেন**। অক্সিজেনের পরিমাণ একশো ভাগের মধ্যে ২১ ভাগ। নাইট্রোজেনের পরিমাণ একশো ভাগের মধ্যে ৭৮ ভাগের কিছু বেশী।

বায়ুতে এ ছাড়াও কিছু পরিমাণ **কার্বন-ডাই-অক্সাইড,** জলীয় বাষ্প এবং আরও কয়েকটি গ্যাস থাকে। এই সব গ্যাসের মধ্যে অক্সিজেন আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অপরিহার্য। অক্সিজেনের সাহায্যে রক্ত পরিষ্কার হয়, দেহ সুস্থ থাকে। অক্সিজেনই আগুন জ্বালাতে সাহায্য করে।

দূষিত বায়ুর উপাদান—আমাদের দেহের পক্ষে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস অত্যন্ত অপকারী। তাই বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বেড়ে গেলে বাতাস আর বিশুদ্ধ থাকে না, দূষিত হয়। ঘন বসতি ও কলকারখানাপূর্ণ অঞ্চলগুলির বাতাস খুবই দূষিত। যে সব জায়গায় খোলা ড্রেন কিংবা কবর-স্থান থাকে, সেখানকার বাতাসও দূষিত হয়। এই সব জায়গার বাতাসে হয় কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বেশী থাকে, না হয় ধোঁয়া, কয়লার গুঁড়ো, পাটের ফেঁসো প্রভৃতি বর্তমান থাকে। তা ছাড়াও থাকে নানা জৈব পদার্থের রেণু এবং ভয়াবহ নানা রোগের জীবাণু। এইজাতীয় দূষিত বাতাস গ্রহণ করার ফলে নানারকম মারাত্মক রোগ দেখা দেয়।

জনাকীর্ণ ও রুদ্ধ গৃহের বায়ু—মানুষ প্রশ্বাসের সঙ্গে অক্সিজেন টেনে নেয় এবং নিশ্বাসের সঙ্গে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে; তা ছাড়া নিশ্বাসের সঙ্গে কিছু পরিমাণ উষ্ণ জলীয় বাষ্পও বের হয়। জনাকীর্ণ কোন ঘরে যদি বাতাস চলাচলের ভাল বন্দোবস্ত না থাকে, তাহলে সে ঘরের বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কমতে থাকে, মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং সে বাতাসে তাপ ও আর্দ্রতার পরিমাণ বেড়ে যায়। এই সব কারণে জনাকীর্ণ রুদ্ধ ঘরের বাতাস দূষিত হয়, এবং সেই দূষিত বাতাস গ্রহণ করে ঘরের বাসিন্দারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার ফলে এমন কি চেতনাও লোপ পেতে পারে, কখনও বা মৃত্যুও ঘটতে পারে।

বায়ু চলাচলের প্রয়োজনীয়তা ও প্রণালী—কাজেই, তোমরা বুঝতে পারছ, ঘরে বিশুদ্ধ মুক্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকা কত দরকার। ঘরে যথেষ্ট দরজা, জানালা ও ঘুলঘুলি থাকলে সেই পথে বায়ু প্রবাহের সঙ্গে বিশুদ্ধ বাতাস ঘরে ঢোকে ও দূষিত বাতাস ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ঘরের দরজা জানালাগুলি এমনভাবে তৈরি করা উচিত, যাতে ঘরের একদিক দিয়ে বাতাস ঢুকে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে।

দূষিত বায়ুর বিশোধন এবং এতে গাছের কাজ—কোন জায়গার বাতাস বিশুদ্ধ করার সবচেয়ে প্রধান উপায় হল, সেখানে যাতে যথেষ্ট পরিমাণে সূর্যের আলো ও খোলা বাতাস আসে, তার ব্যবস্থা করা। সূর্যের আলোতে বাতাসের

ভিতরকার রোগ-জীবাণুগুলি সব মরে যায়। বৃষ্টি হলেও বাতাস পরিষ্কার হয়। বাতাসে যে সমস্ত ভাসমান পদার্থ থাকে, বৃষ্টির ফলে তা নীচে মাটিতে নেমে আসে।

বায়ু বিশোধনের কাজে গাছপালা আমাদের সব চেয়ে বড় সহায়। নিশ্বাসের সঙ্গে আমরা কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করি এবং প্রশ্বাসের সঙ্গে অক্সিজেন গ্রহণ করি। গাছপালারা কিন্তু দিনের বেলায় তার ঠিক উল্টো কাজ করে। তারা অক্সিজেন ছাড়ে, টেনে নেয় কার্বন-ডাই-অক্সাইড। তার ফলে বাতাসে অক্সিজেন আর কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ঠিক থাকে। এইভাবেই উদ্ভিদ আর মানুষ পরস্পরের উপকার করে। কিন্তু মনে রেখ, রাত্রিতে গাছপালা ঠিক মানুষের মতই কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে আর অক্সিজেন টেনে নেয়। সেইজন্য রাত্রিতে গাছপালার নীচের বাতাস অস্বাস্থ্যকর।

শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রণালী—শ্বাস-প্রশ্বাস না চললে, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দম বন্ধ হয়ে আমাদের মৃত্যু ঘটে। প্রশ্বাসের সময় নাসারন্ধ্র দিয়ে শ্বাসনালী-পথে বাতাস আমাদের দেহে প্রবেশ করে। এই সময় বুকও ফুলে ওঠে এবং ফুসফুসের আয়তন বাড়ে। বাতাসও তখন ফুসফুসের ভিতর ঢোকে। এরই নাম **প্রশ্বাস**। বাতাসে থাকে অক্সিজেন। রক্তের ভিতরকার **হিমোগ্লোবিন** নামক পদার্থ বাতাস থেকে সেই অক্সিজেন গ্রহণ করে। দেহের দূষিত রক্ত এই অক্সিজেনের সাহায্যে বিশুদ্ধ হয়। ফুসফুস তখন আবার সঙ্কুচিত হয়। বুকও সঙ্কুচিত হয় সঙ্গে সঙ্গে। ফলে রক্তের দূষিত পদার্থ

কার্বন-ডাই-অক্সাইড রূপে পরিবর্তিত হয়ে ফুসফুস থেকে বেরিয়ে আসে এবং শ্বাসনালী দিয়ে নাসারন্ধ্র-পথে বাইরে বেরিয়ে যায়। এরই নাম নিশ্বাস।

জল

বাতাসের মতই জল না হলেও আমাদের চলে না কোন ভাবে। জল আমাদের জীবন রক্ষা করে। তাই জলের আর এক নাম 'জীবন'।

জলের ধর্ম—জল তরল পদার্থ। জলের কোন রঙ নেই, স্বাদ নেই, গন্ধও নেই। জলের নিজের কোন আকারও নেই। যে পাত্রের মধ্যেই তাকে রাখ না কেন, ঠিক সেই পাত্রের আকারই সে ধারণ করবে। তাছাড়া জলের আর একটি ধর্ম হল, সে সর্বদাই উপর থেকে নীচের দিকে যায়।

জলের আয়তন আছে, চাপ আছে, ওজনও আছে। বাতাসের মত কখনও বেশী জলকে কম জায়গায় সঙ্কুচিত করে রাখা যায় না। জলকে গরম করলে কিংবা ঠাণ্ডা করলে এমন এক সময় আসে, যখন তার রূপের পরিবর্তন হয়। ১০০° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে জল বাষ্পে পরিণত হয়। শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তাপে জল জমে বরফ হয়। তাছাড়া নুন, চিনি প্রভৃতি অনেক জিনিসই জলে গলে যায়। জলে যত বিভিন্ন প্রকার জিনিস দ্রবীভূত হয়, আর কোন পদার্থে তত হয় না।

জলের প্রয়োজনীয়তা—আগেই বলেছি, জল না হলে আমাদের চলে না। আমাদের শরীরের মধ্যে তিনভাগের

দুভাগ জল। ঘাম, প্রস্রাব প্রভৃতির মারফত শরীরের ক্লেদ জলের সঙ্গে বেরিয়ে আসে। নিশ্বাসের সঙ্গেও কিছু জল বেরিয়ে যায় বাষ্পরূপে। জল এইভাবে বেরিয়ে যায় বলেই দেহে জলের মাত্রা ঠিক রাখার জন্য নিয়মিত জল পান করা দরকার হয়। তাছাড়া নানা গৃহস্থালীর কাজে, যেমন রান্না, স্নান, কাপড়চোপড় কাচা, ঘরদোর সাফ রাখা প্রভৃতির জন্যও আমাদের অনেক জল লাগে।

রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখার জন্য এবং অগ্নিকাণ্ডের সময় আগুন নেবানর জন্য জল না হলে আমাদের একেবারেই চলে না। জল না হলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা যায় না কোন ভাবেই। সেই জন্য জলের অভাবে অনেক সময় নানা রকম রোগ দেখা দেয়।

মানুষের মত অন্যান্য জীবজন্তুর জীবনেও জল অপরিহার্য। জল না পেলে তারা বাঁচতে পারে না। শুধু জীবজন্তুই বা কেন, গাছপালাও জল না হলে বাঁচে না। শিকড়ের সাহায্যে গাছ মাটি থেকে খাবার সংগ্রহ করে। জল সেই খাদ্যকে গলিয়ে গাছের উপযোগী করে। জল না পেলে গাছ তাই শুকিয়ে মরে যায়।

জলের উপাদান—জলের মধ্যে আছে দুটি গ্যাস ঃ একটির নাম **অক্সিজেন,** অপরটির নাম **হাইড্রোজেন**। একভাগ অক্সিজেন আর দুভাগ হাইড্রোজেন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মিশ্রিত হওয়ার ফলেই জলের সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু যে জল বিশুদ্ধ নয়, তার মধ্যে নানা গ্যাস ও ধাতব লবণ, জৈব পদার্থ এবং জীবাণু থাকতে পারে। এসব বস্তুগুলি অনেক সময়ই দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে বলে জলের

রূপের কোন পরিবর্তন হয় না। তাই দেখতে পরিষ্কার হলেই যে জল বিশুদ্ধ হবে, একথা কিন্তু মনে কোর না।

তবে এই সকল পদার্থের সবগুলিই যে আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর, তাও নয়। এরা জলের সঙ্গে মিশ্রিত থাকলেই যে জল দূষিত হবে, তার কোন মানে নেই। কোন কোন ঝরণার জলের সঙ্গে এমন অনেক ধাতব পদার্থ মিশান থাকে যা শরীরের পক্ষে উপকারী।

কিন্তু সব ক্ষেত্রেই এরকম ঘটে না। বেশীর ভাগ সময়ই দূষিত জলের সঙ্গে মিশান থাকে নানারকম রোগের জীবাণু। টাইফয়েড, কলেরা, আমাশয় প্রভৃতি মারাত্মক রোগের জীবাণু অনেক সময় দূষিত জলের সাহায্যেই আমাদের শরীরে প্রবেশ করে।

দূষিত জলের দ্বারা সংক্রামিত ব্যাধি—কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়, উদরাময় প্রভৃতি কতকগুলি রোগের জীবাণু জলের সাহায্যে সুস্থ লোকের দেহে প্রবেশ করে এবং রোগ সৃষ্টি করে। ঐসব রোগীর মলমূত্র কিংবা ব্যবহৃত কাপড়-চোপড়, বিছানাপত্র প্রভৃতি পুকুর, কুয়ো বা নদীর জলের সংস্পর্শে এলেই জল দূষিত হয়। সেই দূষিত জল পান করে হাজার হাজার সুস্থ মানুষ রোগাক্রান্ত হয়। কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়, উদরাময় প্রভৃতি মারাত্মক রোগ তখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে মহামারী আকারে। কৃমিরোগও জলের সাহায্যে ছড়াতে পারে। দূষিত জলের জন্য কোষ্ঠকাঠিন্য, ডিস্‌পেপসিয়া প্রভৃতি নানারকম পেটের রোগ দেখা দেয়।

পুকুর, কূপ, নলকূপ ও নদীর জল—শহরের মত জল-সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রামে নেই। গ্রামের লোককে নির্ভর করতে হয়, প্রধানতঃ নদী, পুকুর, কুয়ো বা নলকূপের উপর।

পুকুর—গ্রামের অধিকাংশ লোক পুকুরের জল ব্যবহার করে। কিন্তু পুকুরের জল সহজেই দূষিত হয়। অনেক জায়গায় দেখা যায়—একই পুকুরে লোকে স্নান করে; বাসন মাজে, গরু-মোষ স্নান করায়, বাঁশ-পাট পচায় এবং সংক্রামক রোগগ্রস্ত রোগীর কাপড়চোপড় কাচে। এসব ছাড়াও অনেক সময় আশেপাশের জলনিকাশের নালা বেয়ে নোংরা জল ও আবর্জনা এবং পুকুরপাড়ের গাছের পাতা পুকুরে পড়ে জল অপরিষ্কার হয়। পায়খানা কাছে থাকলে মাটির ভিতর দিয়ে চুইয়ে কিছু পরিমাণ রোগজীবাণুযুক্ত মলও পুকুরে এসে পৌঁছতে পারে। এরকম পুকুরের জল যে পান করার, এমন ।ক বাসন-কোসন ধোবারও উপযুক্ত নয়, তা বলাই বাহুল্য।

পানীয় জলের জন্য প্রতি গ্রামে অন্ততঃ এমন একটি পুকুর থাকা উচিত, যার জল অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা হবে না। পুকুরের পাড় পাশের জমির চেয়ে উঁচু করে দিতে হবে, যাতে বৃষ্টিতে ধুয়ে আবর্জনা পুকুরে এসে না পড়তে পারে।

কাঁচা কুয়ো বা পাতকুয়ো—গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ স্থানে খুব সহজে কুয়ো তৈরি করা হয়। কুয়োর ভিতরটা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পোড়া মাটির বেড় বা 'পাট' দিয়ে বাঁধান হয়। একে সাধারণতঃ বলা হয় পাতকুয়ো। এই রকম কুয়ো অগভীর হয় এবং পাটের জোড়ও ভাল মেশে না। ফলে, উপরের অপরিষ্কার

জল চুইয়ে কুয়োয় ঢোকে। কুয়োর পাড়ের চারধার প্রায়ই পাকা করে বাঁধান থাকে না। সেখানে কাপড়চোপড় কাচা, স্নান করা প্রভৃতি কাজের ফলে কুয়োর জল সহজেই দূষিত হয়। জল তোলবার দড়ি-বালতি অপরিষ্কার হয়ে এবং উপর থেকে ময়লা পড়েও জল দূষিত হয়। কুয়োর চারপাশে বেশ খানিকটা জায়গা সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে দিলে এবং জল তোলার জন্য পাম্প বসালে জল দূষিত হবার সম্ভাবনা অনেক কমে। কিন্তু অগভীর কুয়ো কখনও সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়।

কোন কারণে কুয়োর জল দূষিত হলে চুন, পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বা ব্লিচিং পাউডার কুয়োয় জলে দিলে জল বিশুদ্ধ হয়। এগুলি দেবার কিছু পরে ক্রমাগত জল তুলে ফেলা দরকার, যতক্ষণ পর্যন্ত না আবার পরিষ্কার জল আসে। সাধারণতঃ দু-তিন দিন পরে কুয়োর জল পুনরায় ব্যবহারযোগ্য হয়। অনেক সময়ে পুকুরে চুন দিয়েও জল পরিষ্কার করা হয়।

পাকা কূপ বা ইঁদারা—ইটের গাঁথুনি দিয়ে কুয়ো তৈরি করে ভিতরে সিমেন্টের আস্তরণ দিলে জল সহজে দূষিত হয় না। বিশেষতঃ কূপ গভীর হলে বাইরে থেকে ছাড়া আর কোন উপায়ে জল দূষিত হবার সম্ভাবনা থাকে না। পানীয় জলের পক্ষে সাধারণ অগভীর কুয়োর চেয়ে এই প্রকার গভীর পাকা কুয়ো বা ইঁদারা অনেক ভাল। কুয়োর মুখে একটা ঢাকনা দিয়ে জল তোলার জন্য পাম্প বসাতে পারলে সব দিক থেকেই ভাল হয়।

নলকূপ—আজকাল পল্লী অঞ্চলে জল সরবরাহের জন্য অনেক জায়গায় নলকূপ বসান হচ্ছে। অগভীর হলে
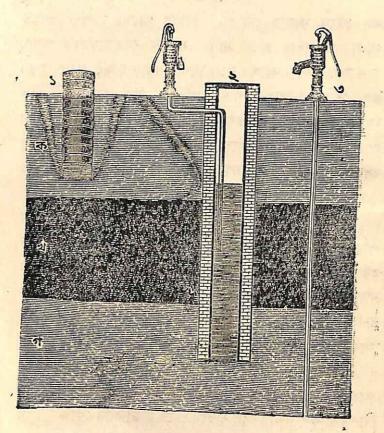
১—মাটির পাট দ্বারা নির্মিত কূপ। ২—পাকা গাঁথুনি দ্বারা নির্মিত কূপ। ৩—নলকূপ। ক—ভূপৃষ্ঠের সর্বোচ্চ স্তর; এই স্তরে জল থাকে। খ—এই স্তরে জল থাকে না। গ—এই স্তরে জল থাকে। ২ নম্বর কূপের মুখ ঢাকা এবং জল তুলিবার জন্য পাম্প বসান আছে।

নলকূপের জলও দূষিত হতে পারে। গভীর হলে জল দূষিত হবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। নলকূপ সাধারণতঃ গভীরই হয়।

নদী—সম্ভাব্য সব রকম উপায়েই নদীর জল দূষিত হয়। অন্য সব কারণ ছাড়াও নদীর ধারে শ্মশান থাকে, নানা জীব-জন্তুর মৃতদেহ নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। তার ফলে নদীর জল রোগজীবাণুতে পূর্ণ থাকে। তবে সূর্যের আলোয় এবং স্রোতের ফলে নদীর জলের অনেক দোষ নষ্ট হয়। কলিকাতার মত যেখানে নদীর ধারে কলকারখানা বা বড় শহর আছে, সেখানে নদীর জল দূষিত হয় অতি সহজেই।

জল বিশোধনের প্রণালী—ঘোলা জলে ফটকিরি দিলে তা নির্মল হয়। পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বা ইলেকট্রোলিটিক ক্লোরিন সহযোগে জলকে রোগজীবাণু-মুক্ত করা যায়। এ ছাড়া বাজারে কয়েক প্রকার ফিল্‌টার পাওয়া যায়, যা রোগজীবাণুগুলিকে ছেঁকে নিয়ে জল শোধন করতে পারে। ফিল্‌টার মাঝে মাঝে ফুটানো জলে পরিষ্কার করা উচিত। 'ফিল্‌টার' কথাটির অর্থ 'খুব ভাল ভাবে ছেঁকে নেওয়ার যন্ত্র'।

পাড়াগাঁয়ে অনেকে কলস-ফিল্‌টার ব্যবহার করেন। এই ব্যবস্থায় প্রায়ই চারটি মাটির কলসী একটি কাঠের ফ্রেমের মধ্যে পর পর উপর থেকে নীচে সাজান থাকে। সবার নীচের কলসীটি ছাড়া অন্যগুলির তলায় ফুটো থাকে। ময়লা জল প্রথমে কাপড়ে ছেঁকে নিয়ে সবার উপরের কলসীটিতে ঢালা হয়। দ্বিতীয় কলসীটিতে থাকে কাঠকয়লা, আর তৃতীয়টিতে থাকে বালির স্তর। কাঠকয়লা আর বালি জলের

ময়লা ছেঁকে নিয়ে জলকে পরিষ্কার করে, ফলে জল শোধিত হয়। এই শোধিত জল ফুটিয়ে নিলে তা জীবাণুমুক্ত হয়।

জল শোধনের শ্রেষ্ঠ উপায় জল ফোটান। খানিকক্ষণ ফুটলে জলের সমস্ত রোগজীবাণু মরে যায়। জল ফোটালে দ্রবীভূত বাতাস জল থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় জল বিস্বাদ লাগে। তাই ফোটান জল কয়েকবার ঢালা-উবুড় করলে বাতাস পুনরায় জলের সাথে মিশে জলের স্বাদ ফিরিয়ে আনে।

মৃদু জল ও খর জল

কোন কোন জলে সাবানের ফেনা বেশ ভাল হয়। কোন জলে আবার ফেনা হতেই চায় না। যে জলে ভাল ফেনা হয় না, তাকে বলে খর জল। আর যে জলে সহজেই ফেনা হয়, তাকে বলা হয় মৃদু জল।

জল খর হওয়ার কারণ, তার মধ্যে থাকে নানা খনিজ লবণ। এইসব লবণের মধ্যে ম্যাগনেসিয়াম এবং ক্যালসিয়াম ধাতুর লবণই বেশী। সাধারণতঃ টিউবওয়েল ও ঝরনার জল খর হয়। বৃষ্টির জল সবচেয়ে মৃদু।

ভাল করে ফেনা হতে চায় না বলে খর জলে সাবান দিয়ে কাপড় কাচা এক দুরূহ ব্যাপার। রান্নার কাজেও খর জল উপযোগী নয়। এ জলে ভাত-ডাল সিদ্ধ হতে চায় না।

খর জল দু' রকমের—স্থায়ী এবং অস্থায়ী। অস্থায়ী খর জল শুধু ফুটিয়ে নিলেই মৃদু হয়। কিন্তু স্থায়ী খর জলকে মৃদু করতে হলে কাপড়-কাচা সোডা তার সঙ্গে মেশান দরকার হয়।

কয়েকটি রোগের সাধারণ আলোচনা

ম্যালেরিয়া

ম্যালেরিয়ার সঙ্গে যে মশার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, তা তোমরা সকলেই জান। মশা কিন্তু ম্যালেরিয়ার কারণ নয়, বাহক মাত্র। আবার শুধু এনোফিলিস জাতের স্ত্রীমশা-ই ম্যালেরিয়ার বাহক।

যে-ব্যক্তির ম্যালেরিয়া হয়, তার রক্তের লোহিত কণিকার মধ্যে এই রোগের জীবাণু বাসা করে থাকে। বিশেষ অবস্থায় এই রোগীকে কোন মশায় কামড়ালে রোগের জীবাণু মশার শরীরে প্রবেশ করে। মশার শরীরে কয়েক দিন থাকার পর জীবাণুগুলি সংখ্যায় বেড়ে উপযুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই সময় সেই মশাটি যদি কোন সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ায়, তা হলে রোগজীবাণু সেই ব্যক্তির দেহে সংক্রামিত হয়। আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে রোগজীবাণু দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে, এবং এক প্রকার বিষ তৈরী হয়। এর ফলে হয় জ্বর। জ্বরের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়। কোন ক্ষেত্রে রোজ জ্বর হয়; কখনও বা এক দিন অন্তর, কখনও বা দু দিন অন্তর, আবার কখনও বা তিন দিন অন্তর জ্বর হয়।

সংক্রমণ নিবারণের উপায়—(১) মশককুল ধ্বংস করাই ম্যালেরিয়া নিবারণের সবচেয়ে ভাল উপায়। প্রথমতঃ, বাড়ির আশেপাশের ডোবা প্রভৃতি ভরাট করা দরকার। ভাঙ্গা হাঁড়ি-কলসী, জলনিকাশের বদ্ধ নালা প্রভৃতিতে যাতে মশা না

জন্মাতে পারে, সে-ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কেরোসিন তেল প্রভৃতি কয়েকটি তৈলজাতীয় জিনিস জলের উপর ছড়িয়ে দিলে মশা জন্মাতে পারে না। বড় বড় জলাশয়ে ছোট ছোট মাছ ছেড়ে দিলে মশার ডিম তারা খেয়ে ফেলে। দেয়ালের কোণে কোণে, অন্ধকার জায়গায় ডি-ডি-টি ছিটিয়ে দিলে সেই সব জায়গার মশা মরে যায়।
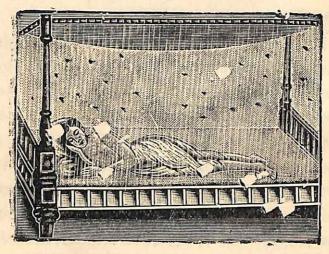
মশারি ব্যবহার করলে মশা আমাদের কামড়াতে পারে না

(২) মশারি টাঙিয়ে শুলে অসুস্থ লোকের দেহ থেকে মশা ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে নিয়ে যেতে পারে না ; আবার সুস্থ লোককেও মশায় কামড়াতে পারে না। সুতরাং সকলেরই মশারি ব্যবহার করা উচিত।

(৩) যেখানে ম্যালেরিয়া বেশী হয়, সেখানে সুস্থ লোকেরও কুইনাইন বা অন্য কোন ম্যালেরিয়ার ওষুধ

নিয়মিত খাওয়া উচিত। সুতরাং সংক্ষেপে ম্যালেরিয়া নিবারণের পর পর ধাপগুলি হল—প্রথমতঃ, মশা যাতে বাড়তে না পারে; দ্বিতীয়তঃ, বাড়লেও মশা যাতে কামড়াতে না পারে; তৃতীয়তঃ, কামড়ালেও মশা যাতে কিছু ক্ষতি না করতে পারে।

কলেরা

কলেরা যেমন হঠাৎ আক্রমণ করে, সময়ে চিকিৎসা না করলে তেমনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মারাত্মক হয়ে পড়ে। কলেরা হয়েছে বলে সন্দেহ হলেই তৎক্ষণাৎ সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কলেরায় খুব বমি ও দাস্ত হতে থাকে। এই বমি এবং মলের সঙ্গে কলেরার জীবাণু রোগীর শরীর থেকে বের হয়। ম্যালেরিয়ার বাহক যেমন মশা, কলেরার বাহক তেমনি মাছি। তাছাড়া কলেরা-জীবাণু দ্বারা দূষিত জল ও খাদ্যও কলেরা রোগ বিস্তারের প্রধান সহায়।

কলেরার জীবাণু

মাছি একবার কলেরা রোগীর মল বা বমিতে বসলে কলেরার জীবাণু তার শরীরে লেগে যায়; তারপর সেই মাছি কোন খাবারে বসলে রোগজীবাণু খাবারেও লেগে যায় এবং সুস্থ লোকে তাই খেয়ে কলেরায় আক্রান্ত হয়।

সংক্রমণ নিবারণের উপায়—কলেরা নিবারণের জন্য প্রথমতঃ মাছি ধ্বংস করা দরকার এবং জল, দুধ প্রভৃতি সমস্ত খাবার জিনিস সব সময়ে ঢেকে রাখা উচিত।
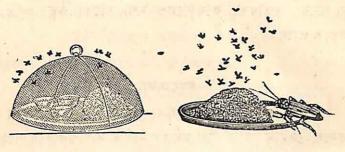
ঢাকা খাবার আলগা খাবার

কলেরা রোগীকে সম্পূর্ণ পৃথক করে রাখা প্রয়োজন। পুকুর বা কুয়োর জল যাতে কলেরা রোগীর কাপড়চোপড় দ্বারা দূষিত না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। কলেরা রোগীর মলমূত্র একটি পাত্রে করে সাবধানে বাড়ি ও পুকুরাদি থেকে দূরে কোথাও নিয়ে গিয়ে মাটির তলায় পুঁতে ফেলা উচিত। কলেরা রোগীর কাপড়চোপড়-বিছানাপত্র আগুনে পুড়িয়ে ফেলাই সবচেয়ে নিরাপদ। খাবার জল ফুটিয়ে খাওয়া দরকার। কোথায়ও কলেরার প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কা ঘটলেই প্রত্যেকের কলেরার টিকা নেওয়া উচিত। সাধারণতঃ কলেরার টিকা মাস ছয়েকের বেশী কার্যকরী থাকে না, এ কথাটা মনে রাখা দরকার।

আন্ত্রিক জ্বর বা টাইফয়েড

টাইফয়েড রোগের জীবাণুও কলেরার মত জল, দুধ এবং খাদ্য থেকে সুস্থ শরীরে প্রবেশ করে পেটের মধ্যে যায় এবং

রোগ জন্মায়। টাইফয়েডও খুব মারাত্মক রোগ। যে-সব জায়গায় বিশুদ্ধ জল সরবরাহের ব্যবস্থা আছে, সে-সব জায়গায় টাইফয়েড সহজে বিস্তার লাভ করতে পারে না। সুতরাং কলেরার জন্য যে-সব সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, টাইফয়েড-প্রতিরোধেও সেই সব ব্যবস্থা প্রযোজ্য।

আজকাল টাইফয়েড রোগের প্রতিরোধক টিকা বেরিয়েছে। অনেক জায়গায় প্রতি বছরই অন্ততঃ একবার টাইফয়েডের মরশুম দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে প্রতি বছরই একবার টিকা নেওয়া ভাল।

বসন্ত

বসন্ত রোগের মত যন্ত্রণাদায়ক মারাত্মক ব্যাধি খুব কমই আছে। রোগীর গায়ে অসহ্য ব্যথা হয়, সারা গায়ে মসূর ডালের মত পুঁজভরা গুটি বের হয় এবং প্রবল জ্বর হয়। ক্ষত শুকোবার সময় এই গুটি থেকে রোগের জীবাণু বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রশ্বাসের সঙ্গে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করে রোগ জন্মায়।

সংক্রমণ নিবারণের উপায়—বসন্ত রোগের টিকা নেওয়া সর্বতোভাবে উচিত। বাড়িতে কারো বসন্ত হলে রোগীকে সম্পূর্ণ পৃথক করে সব সময় মশারির মধ্যে রাখলে রোগ সহজে ছড়াতে পারে না। যারা শুশ্রূষা করবে, তারা ছাড়া আর কেউ যেন রোগীর ঘরে না ঢোকে। একটি পাত্রে রোগজীবাণুনাশক ওষুধ জলে গুলে সেই দ্রবণের মধ্যে রোগীর পুঁজ, কফ, মল, মূত্র প্রভৃতি রাখা উচিত; পরে তা পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা

বাড়ি ও জলাশয় থেকে দূরে কোথাও মাটির নীচে পুঁতে ফেলতে হবে। রোগীর কাপড়চোপড়, বিছানাপত্র পুড়িয়ে ফেলাই ভাল। বসন্ত রোগীর গুটি শুকিয়ে যখন খোসা ওঠে, তখন বিশেষভাবে সাবধান হওয়া দরকার। খোসাগুলি কোন ঢাকনাওয়ালা পাত্রে জড়ো করে আগুনে পুড়িয়ে ফেলাই সব চেয়ে নিরাপদ।

যক্ষ্মা

যক্ষ্মারোগ আমাদের দেশে অত্যন্ত বেড়ে চলেছে। এক রকম ক্ষুদ্র জীবাণু যক্ষ্মা রোগের কারণ।

যক্ষ্মারোগের জীবাণু বায়ুবাহিত। রোগীর কফ এবং থুথুর সঙ্গে প্রচুর জীবাণু বের হয়। কফ বা থুথু শুকিয়ে গেলে সূক্ষ্ম জীবাণু বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে এবং বাতাসের সঙ্গে সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে।

সংক্রমণ নিবারণের উপায়—যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য, উপযুক্ত আলোবাতাস এবং সুপরিসর স্থানের ব্যবস্থা থাকলে দেশে যক্ষ্মারোগ এত তাড়াতাড়ি বিস্তারলাভ করতে পারে না। যক্ষ্মা-প্রতিরোধক বি-সি-জি টিকা সবারই নেওয়া উচিত।

যক্ষ্মার জীবাণু

বাড়ির কারো এই রোগ হলে হাসপাতালে বা স্বাস্থ্য-নিবাসে পাঠানই ভাল। অন্যথা রোগীকে আলো-বাতাসযুক্ত পৃথক ঘরে রাখা উচিত এবং তার জন্য বিছানাপত্র,

কাপড়চোপড়, বাসনকোসন সবই আলাদা রাখা দরকার। রোগীকে উপযুক্ত পরিমাণে পুষ্টিকর পরিষ্কার খাদ্য দেওয়া উচিত। একটি পাত্রে রোগজীবাণুনাশক ওষুধ জলে গুলে সেই দ্রবণ বা লোশনের মধ্যে রোগীর কফ এবং থুথু ফেলা উচিত এবং পাত্রটিও সব সময় ঢেকে রাখা উচিত।

আকস্মিক দুর্ঘটনা ও প্রাথমিক চিকিৎসা

সাবধানতা সত্ত্বেও বহু সময়ে দুর্ঘটনা নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই ঘটে। এ রকম কোন বিপদ ঘটলে প্রাথমিক চিকিৎসায় বা সাহায্যে বিশেষ উপকার হয়, এমন কি বহু ক্ষেত্রে প্রাণ রক্ষাও হতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসার কয়েকটি সাধারণ নিয়ম সর্বদা মনে রাখা দরকার। প্রথমতঃ, নিতান্ত সামান্য আঘাত ছাড়া চিকিৎসককে খবর দেওয়া সব সময়েই কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ, আহত ব্যক্তির শ্বাসক্রিয়ার যাতে কোন ব্যাঘাত না ঘটে সেজন্য জামাকাপড়, বিশেষ করে গলা, বুক ও পেটের কাছের জামাকাপড় আলগা করে দেওয়া উচিত। তৃতীয়তঃ, আহত ব্যক্তির কাছে কখনও ভিড় জমতে দেওয়া উচিত নয়। বেশী আঘাতে, এমন কি শুধু আতঙ্কে অনেক সময় শরীর বিকল হয়ে পড়ে, তাকে বলা হয় 'শক্ লাগা'। শক্ লাগলে শরীর ঝিমিয়ে পড়ে, অনেক সময় ঘাম হয়, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। সহজ ভাষায় 'নাড়ি ছাড়বার' মত অবস্থা হয়।

পুড়ে গেলে শক্ সাধারণতঃ বেশী হয়। শক্ লাগার সম্ভাবনা থাকলে রোগীকে গরম রাখা বিশেষভাবে দরকার।

আগুনে পোড়া

কাপড়-জামায় আগুন লাগলে কখনও ভয় পেয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে নেই। জামাকাপড় যদি সহজে খুলে ফেলতে পারা যায় তো ভালই, না হলে কম্বল, চট, তোশক প্রভৃতি হাতের কাছে যা পাওয়া যায়, তাই জড়িয়ে দিলে আগুন নিবে যাবে। তাও যদি সম্ভব না হয় তো মাটিতে শুয়ে পড়ে গড়াগড়ি দিলেও আগুন নিববে।

সামান্য পুড়ে বা ঝলসে গেলে স্পিরিটে ভেজানো তুলো বা নেকড়া দিয়ে জায়গাটা চেপে ধরলে যন্ত্রণা কমে যায়। আগেই বলেছি, পুড়ে গেলে শক্ প্রায় সর্বদাই হয়, সুতরাং সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। ফোস্কা পড়লে তা গেলে দেওয়া উচিত নয়। জামাকাপড় পুড়ে গিয়ে যদি শরীরের কোথাও আটকে যায়, তবে তা ছাড়াবার চেষ্টা কোর না। পুড়ে গেলে কখনও ঘি, তেল, মলম প্রভৃতি কোন তৈলাক্ত জিনিস পোড়ার উপর লাগাতে নেই। পরিষ্কার কাপড় দিয়ে পোড়া জায়গাটা ঢেকে ঢিলা করে বেঁধে দেবে।

অ্যাসিডে পুড়লে এক গেলাস জলে এক চামচ সোডিয়াম বাইকার্বনেট মিশিয়ে ক্ষতস্থানে ব্যবহার করা যায়। ক্ষারের সংস্পর্শে পুড়লে পাতিলেবুর রস বা তেতুল-গোলা জল ব্যবহার করতে পার।

জলে ডোবা

জলে ডুবলে মানুষের দম বন্ধ হয়ে যায়। জলমগ্ন ব্যক্তিকে জল থেকে তোলার পর তার ফুসফুসে যে জল ঢুকেছে তা বের করবার চেষ্টা করা সর্বাগ্রে দরকার। নাকে-মুখে যদি কাদা বা জলজ উদ্ভিদ আটকে থাকে, তবে তা আগে পরিষ্কার করে দেবে।

শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবর্তন—নাক-মুখ পরিষ্কার করে জলমগ্ন ব্যক্তিকে উপুড় করে শোয়াতে হবে, মাথাটা যেন এক পাশে
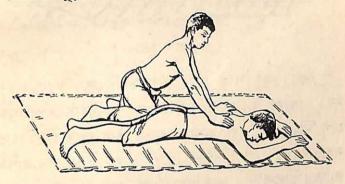
শ্বাস গ্রহণ করান

কাৎ হয়ে থাকে এবং হাত দুটো সামনের দিকে ছড়ান থাকে। তারপর তার পিঠের কাছে হাটু গেড়ে বসবে। দুই হাতের পাতা তার পিঠের উপর রেখে দেহের সমস্ত ভার দিয়ে আস্তে আস্তে চাপ দেবে, যেন ঝাঁকুনি না লাগে। চাপের ফলে বুক সঙ্কুচিত হওয়ায় ভিতরের বাতাস এবং জল নাক-মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবে। তারপর ধীরে ধীরে চাপ কমিয়ে দিলে

বুক প্রসারিত হয়ে বাতাস টেনে নেবে। এই ভাবে নিজের শ্বাস-প্রশ্বাস অনুসারে ক্রমান্বয়ে চাপ দিতে হবে এবং চাপা আলগা করতে হবে।
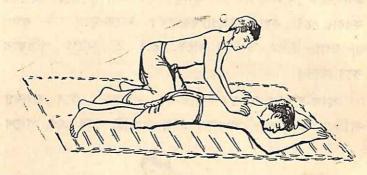
শ্বাস ত্যাগ করান

একটু একটু শ্বাস ফিরে এলে তখনি ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। জলমগ্ন ব্যক্তির নিশ্বাস ফেলা এবং প্রশ্বাস নেওয়া বুঝে চাপ দিতে হবে এবং আলগা করতে হবে, যাতে শ্বাসক্রিয়ার সহায়তা হয়। শ্বাস সম্পূর্ণ ফিরে এলে ভিজে জামাকাপড় ছাড়িয়ে শুকনো কিছু দিয়ে চাপা দিতে হবে এবং হাত-পা গরম রাখতে হবে—এক কথায় শক্ নিবারণ করতে হবে। সম্ভব হলে কিছু গরম দুধ, চা প্রভৃতি খেতে দেওয়া যেতে পারে।

পাগলা কুকুরে কামড়ান

কুকুরের অনেক সময় 'রেবিজ' নামে এক প্রকার রোগ হয়। রেবিজ রোগে আক্রান্ত হলে কুকুর পাগলের মত হয়। রোগের প্রথম অবস্থায় বিশেষ কোন চিহ্ন দেখা যায় না।

শেষের দিকে পাগলা কুকুরটির চোখ রক্তবর্ণ হয়, মুখ থেকে সব সময় আঠার মত লালা বের হতে থাকে, মাথা এবং লেজ নীচু করে সে ইতস্ততঃ ছুটোছুটি করে। এই অবস্থায় জল গিলবার ক্ষমতা থাকে না বলে চেষ্টা করেও সে জল খেতে পারে না। এ রোগকে তাই জলাতঙ্ক রোগও বলা হয়। কোন লোককে কামড়াবার দশ দিনের মধ্যে যদি কুকুরটি মারা যায়, তা হলে বুঝতে হবে, কুকুরটি জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হয়েছিল।

পাগলা কুকুর যাকে কামড়ায়, তারও জলাতঙ্ক রোগ হতে পারে। কখনও কখনও দিন পনেরোর মধ্যেই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়, কখনও বা বছরখানেক পরে রোগ দেখা দেয়। সুতরাং পাগলা কুকুরে কামড়ালেই সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবিধানের চেষ্টা করা উচিত। যেখানে কুকুরে কামড়েছে, সেখানে তীব্র নাইটি ক বা কার্বলিক অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া ভাল।

সাপে কামড়ান

সাপেকে ভয় করে না এমন লোক কমই আছে। কিন্তু সাপমাত্রই বিষধর নয়। বিষধর সাপেরই কেবল বিষদাঁত থাকে। বিষদাঁত সংখ্যায় দুটি এবং অন্যান্য দাঁতের চেয়ে আকারে বড়। সাধারণ অবস্থায় এই দাঁতগুলি মোড়া থাকে। ছোবল দেবার সময় সাপ এই দাঁত দুটি সোজা করে সবলে বসিয়ে দেয়। দাঁত দুটি ফাঁপা নলের মত। বিষের থলি থেকে বিষ এই নল দিয়ে বেরিয়ে কাটা জায়গায় প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে রক্তের সঙ্গে সারা দেহে সঞ্চারিত হয়।

সাপের বিষ অত্যন্ত দ্রুত দেহের ক্ষতি করে ; দু-তিন ঘণ্টার মধ্যেও মৃত্যু ঘটতে পারে। সুতরাং কামড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে খবর দেবে এবং বিষ যাতে রক্তের সঙ্গে দেহে ঢুকতে না পারে, সেজন্যে কাটা জায়গার একটু উপরে পর পর দু' জায়গায় তৎক্ষণাৎ তাগা বাঁধবে। গামছা, রুমাল বা

সাপের বিষদাঁত তাগা বাঁধার প্রণালী

এক টুকরো কাপড় সেই জায়গায় শক্ত করে বেঁধে তার উপর একটি ফাঁস লাগাতে হবে। ফাঁসের মধ্যে লাঠি, কাঠি, পেনসিল প্রভৃতি যে-কোন শক্ত জিনিস ঢুকিয়ে তাতে পাক দিলে বাঁধন আরও শক্ত হবে। তাগা বাঁধার উদ্দেশ্য রক্ত চলাচল বন্ধ করা, যাতে রক্তের সঙ্গে মিশে বিষ সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে না পড়ে।

অনুশীলনী

১। বায়ুপ্রবাহ কাকে বলে ও কি ভাবে সৃষ্টি হয়?

২। বায়ুর ধর্ম কি কি? বিশুদ্ধ ও দূষিত বায়ুর উপাদান কি কি?

৩। বায়ুর বিশোধন হয় কি ভাবে? বায়ু চলাচলের প্রণালী কি?

৪। মুক্ত বায়ুর প্রয়োজনীয়তা কি?

৫। জলের উপাদান ও প্রয়োজনীয়তা কি? জলের ধর্ম কি? মৃদু জল ও খর জল কাকে বলে?

৬। দূষিত জলকে কি ভাবে বিশুদ্ধ করা যায়? দূষিত জল কি কি রোগ ছড়ায়?

৭। ম্যালেরিয়া কি ভাবে হয়? ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায় কি? কলেরা ও আন্ত্রিক জ্বর হয় কেন? তাদের সংক্রমণ নিবারণের পন্থা কি? বসন্ত ও যক্ষ্মা রোগের সংক্রমণ নিবারণের পন্থা নির্দেশ কর।

৮। প্রাথমিক চিকিৎসার সাধারণ নিয়মগুলি কি? কোন্ দুর্ঘটনায় সবচেয়ে বেশী শক্ লাগার সম্ভাবনা থাকে? শক্ লাগলে কি করা উচিত? বিভিন্ন আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রাথমিক চিকিৎসার বর্ণনা দাও। পাগলা কুকুর চিনবার উপায় কি?

নবম অধ্যায়

চুম্বক ও বিদ্যুতের ব্যবহার

চুম্বক-শক্তি

তোমরা অনেকেই বোধ হয় চুম্বক দেখেছ। লোহা এবং নিকেল ধাতুকে যে বস্তু আকর্ষণ করতে পারে, তাকে বলা হয় চুম্বক। সাধারণতঃ তিন জাতের চুম্বক দেখা যায়—**স্বাভাবিক, কৃত্রিম** এবং বৈদ্যুতিক চুম্বক। **স্বাভাবিক চুম্বক** এশিয়া মাইনর, স্পেন প্রভৃতি দেশে খনিতে পাওয়া যায়। এগুলি দেখতে কাল্‌চে পাথরের টুকরোর মত। চ্যাপ্‌টা বাঁকা প্রভৃতি নানা আকারের চুম্বক কিনতে পাওয়া যায়। ঘোড়ার খুরের মত আকৃতির চুম্বক তোমরা দেখেছ বোধ হয়।

কৃত্রিম চুম্বক—একটি সাধারণ লোহার টুকরোর উপরটা যদি একটি চুম্বক দিয়ে বারকয়েক ঘষা যায়, তাহলে সেই লোহার টুকরোটিও চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়। ইস্পাতের টুকরো হলে চুম্বকত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়। এছাড়া বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যেও কৃত্রিম চুম্বক তৈরি করা যায়। নরম পেটা-লোহার উপর তারের কুণ্ডলী জড়িয়ে তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালিত করলে লোহাটি চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ হলেই চুম্বকত্ব আর থাকে না। এই রকম চুম্বককে **বৈদ্যুতিক চুম্বক** বলে। বৈদ্যুতিক চুম্বক খুব শক্তিশালী হয়।

খুরাকৃতি চুম্বক

চুম্বকের গুণ—চুম্বকের প্রধান গুণ লোহাকে আকর্ষণ করা। লোহা ছাড়া ইস্পাত, নিকেল প্রভৃতি ধাতুকেও চুম্বক আকর্ষণ করে। নীচের ছবিতে দেখ, একখণ্ড চুম্বককে সরু স্থতো দিয়ে বেঁধে ভূমির সমান্তরাল করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর চুম্বকটি তার দু'পাশে অজস্র লোহার গুঁড়ো আকর্ষণ করে আটকে রেখেছে। তাছাড়াও দেখ, চুম্বকটি সব সময় উত্তর-দক্ষিণ দিকে মুখ করে আছে। তোমরা অনেকেই হয়ত চুম্বক-শলাকা দেখেছ। চুম্বক-শলাকার দুই প্রান্তও সব
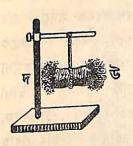
চুম্বকের লোহার কণা আকর্ষণ
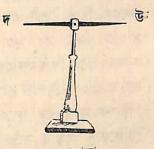
চুম্বক-শলাকা

সময় ঠিক উত্তর-দক্ষিণ দিকে থাকে। চুম্বকের এ এক বিশেষ গুণ—যেভাবেই রাখ না কেন, তার প্রান্ত দুটি ঠিক উত্তর-দক্ষিণে যাবেই। উত্তর দিকে তার যে মুখ থাকে, তাকে বলে **উত্তর মেরু**, আর দক্ষিণ দিকে যে মুখ থাকে, তার নাম **দক্ষিণ মেরু**।

আরও একটা মজার ব্যাপার আছে। দুটি চুম্বকের বিপরীত মেরু যদি পরস্পরের কাছাকাছি আনা যায়, তাহলে তারা পরস্পরকে আকর্ষণ করে; কিন্তু একই জাতীয় মেরু দুটি কাছে এলে করে বিকর্ষণ, অর্থাৎ পরস্পরকে দূরে ঠেলে দেয়।

চুম্বকখণ্ড যদি আগুনে পোড়ান যায়, কিংবা সজোরে তাকে যদি আঘাত দেওয়া হয়, তাহলে তার চুম্বকত্ব আর থাকে না, নষ্ট হয়ে যায়।

চুম্বকের ব্যবহার—চুম্বক আমাদের অনেক উপকারে লাগে। চুম্বকের উত্তর মেরু সব সময়েই উত্তর দিকে মুখ করে থাকে বলে চুম্বকের সাহায্যে দিক নির্ণয় করা সহজ। চুম্বক দিয়ে তাই দিক্ নির্ণয় যন্ত্র তৈরী হয়েছে।

আমাদের দেশে টাকা, আধুলি, সিকি প্রভৃতি আজকাল নিকেল দিয়ে তৈরী হয়। প্রতারকেরা অনেক সময় দস্তার সাহায্যে এই সব মুদ্রা জাল করে। চুম্বক নিকেলকে আকর্ষণ করে, কিন্তু দস্তাকে করে না। তাই চুম্বকের সাহায্যে বুঝা যায়, কোন্ মুদ্রাটি নকল আর কোন্‌টি আসল। তাছাড়া বিদ্যুৎ-সংক্রান্ত বহু কাজে চুম্বকের ব্যবহার হয়। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রভৃতি যন্ত্রে চুম্বক অপরিহার্য। বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করতেও চুম্বকের প্রয়োজন। যাঁরা মেশিনে কাজ করেন, অনেক সময় তাঁদের চোখে লোহার কুচি ঢুকে যায়। চুম্বক দিয়ে ডাক্তারেরা সেই লোহা চোখ থেকে বের করেন। কাজ করতে করতে যন্ত্রপাতির ভিতর নাট-বল্টু পড়ে গেলে, চুম্বকের সাহায্যে তা তোলা যায় সহজেই।

বিদ্যুৎ-শক্তি

বর্তমান যুগ বিদ্যুতের যুগ। বিদ্যুৎ-শক্তি ছাড়া বর্তমান জগৎ এক পা-ও চলতে পারে না। ছোট্ট টর্চলাইট থেকে শুরু করে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কলকারখানা সবই চলে বিদ্যুতের

সাহায্যে। ঝড়বৃষ্টির সময় আকাশে বিদ্যুৎ-চমকান তোমরা সবাই দেখেছ। কি সাংঘাতিক তার শব্দ, আর কি তীব্র তার আলো!

বিদ্যুৎ দু'রকমের—**স্থির-বিদ্যুৎ** ও **চল-বিদ্যুৎ**। একটা হাড়ের চিরুনিকে কিছুক্ষণ মাথার শুকনো চুলে ঘষে যদি ছোট কয়েক খণ্ড কাগজের টুকরোর কাছে ধর, দেখবে কাগজের টুকরোগুলি চিরুনির গায়ে লেগে গেছে। কাচের দণ্ডকে সিল্ক দিয়ে ঘষলেও এই একই ফল লক্ষ্য করবে। ঘর্ষণের ফলে চিরুনি বা দণ্ডের মধ্যে এই যে শক্তির জন্ম হয়, তা কিন্তু চুম্বক-শক্তি নয়, তা বিদ্যুৎ-শক্তি, এবং এই বিদ্যুৎ-শক্তির নাম হল স্থির-বিদ্যুৎ।
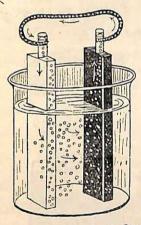
বৈদ্যুতিক কোষ (ব্যাটারী)

চল-বিদ্যুৎ তৈরী হয় অন্য উপায়ে। একটি কাচের পাত্রে জলমিশ্রিত সালফিউরিক অ্যাসিড নাও। তার মধ্যে একটি দস্তার আর একটি তামার দণ্ড একটু দূরে দূরে দাঁড় করিয়ে রাখ। তাদের কিছু অংশ অ্যাসিডের উপরে থাকবে। এইবার এক টুকটো তার দণ্ড দুইটির মাথার সঙ্গে আটকে দাও। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হবে, তারের ভিতর দিয়ে চলতে থাকবে বিদ্যুৎ-প্রবাহ। এই যন্ত্রটিকে বলা হয় **বৈদ্যুতিক কোষ** বা সেল। টর্চে যা ব্যবহার করা হয়, তা-ও

এক প্রকার সেল। অ্যাসিড আর দস্তার মধ্যে রাসায়নিক যোগাযোগের ফলে এক শক্তির সৃষ্টি হয়। সেই শক্তিই রূপান্তরিত হয় বিদ্যুৎ-শক্তিতে। তারের সংযোগটি যদি বিচ্ছিন্ন হয়, বিদ্যুৎ-প্রবাহও তাহলে বন্ধ হয় সঙ্গে সঙ্গে।
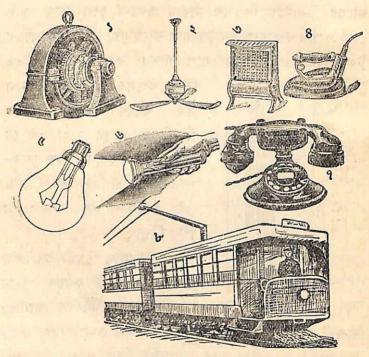
১। বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র (মোটর), ২। বৈদ্যুতিক পাখা, ৩। বৈদ্যুতিক উনুন, ৪। বৈদ্যুতিক ইস্ত্রী, ৫। বৈদ্যুতিক বাতি (বাল্‌ব্), ৬। টর্চ, ৭। টেলিফোন. ৮। ট্রাম।

বিদ্যুতের ব্যবহার—ঘর-সংসারের কাজ থেকে শুরু করে অনেক বড় বড় কাজ আজ চলছে বিদ্যুতের সাহায্যে।

বিদ্যুতের সাহায্যেই ঘরে আজ পাখা চলছে, কলিং বেল বাজছে, উনুন জ্বলছে, কাপড়চোপড় ইস্ত্রী হচ্ছে, উজ্জ্বল আলোয় ঘর আলোকিত হচ্ছে। বিদ্যুতের সাহায্যে বাইরে চলছে ট্রাম, ট্রেন প্রভৃতি। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও প্রভৃতির উদ্ভাবন হয়েছে; এরাও চলে বিদ্যুতে। এদের সাহায্যে, দূর হয়েছে আজ নিকট। বেতার-টেলিভিশনের সাহায্যে এক দেশের খবর ও ছবি এক নিমিষেই পৌঁছে যাচ্ছে আর এক দেশে। তাহলে বুঝতে পারছ, বিদ্যুৎ-শক্তি কাজে লাগাবার ক্ষমতা আমাদের না হলে, এসব কিছুই হত না। মানুষের সভ্যতার যাত্রাপথে বিদ্যুৎ-শক্তি তাই একটি অমূল্য সম্পদ।

অনুশীলনী

১। চুম্বক কয় প্রকার? চুম্বকের ধর্ম কি, চুম্বকত্ব নষ্ট হয় কি ভাবে?

২। স্থির-বিদ্যুৎ ও চল-বিদ্যুৎ কি ভাবে সৃষ্টি করা যায়? বিদ্যুতের সাহায্যে চলে, এমন কতকগুলি জিনিসের নাম কর। বিদ্যুৎ অমূল্য সম্পদ কেন?

দশম অধ্যায়

প্রকৃতি-বিজ্ঞান সমিতি ও কৃষক সমিতি সংগঠন এবং কৃষি প্রচারপত্র সম্পাদন

প্রকৃতি-বিজ্ঞান সমিতি—শুধু বই পড়ে বিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষালাভ সম্পূর্ণ হয় না। তার জন্যে হাতে-কলমে পরীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আর এ কাজ একা করা যায় না, চাই সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা।

প্রথমেই তাই একটি বিজ্ঞান সমিতি গড়ে তোলার চেষ্টা করবে। সমিতির সভ্যরা গাছপালা, ফুল-ফল, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি সংগ্রহ করবে এবং তাদের সম্বন্ধে নানা তথ্য আহরণ করবে। সমিতির তরফ থেকে বৈজ্ঞানিক পুঁথিপত্র সংগ্রহেরও চেষ্টা করতে পার। মাঝে মাঝে সমিতির বৈঠক ডাকবে। বৈঠকে নিজেদের সংগৃহীত জিনিসগুলি ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করবে। সম্ভব হলে নামকরা বিজ্ঞানীদেরও সমিতির সভায় নিমন্ত্রণ করে এনে তাঁদের কাছ থেকে অনেক কথা জেনে নিতে পার। এভাবে চললে দেখবে, বিজ্ঞান সম্বন্ধে অল্প দিনের মধ্যেই তোমাদের জ্ঞানের পরিধি অনেক বেড়ে যাবে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তখন তোমরা ব্যবহারিক জীবনেও, বিশেষতঃ কৃষির উন্নতির কাজে, কিছু কিছু প্রয়োগ করতে পারবে।

কৃষক সমিতি ও কৃষি প্রচারপত্র—তোমাদের মধ্যে গ্রামে যারা থাক, তারা কৃষক সমিতিও গড়ে তুলবে। একে কৃষিবিদ্যা সমিতিও বলতে পার। নানা কারণে ভারতের কৃষক শ্রেণীর জীবন সীমাহীন অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তোমাদেরই আজ বিজ্ঞানের সঠিক পথ দেখিয়ে তা দূর করার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত। কৃষকের প্রধান শত্রুর দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। অশিক্ষাই হল সেই শত্রু। নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করে এবং লেখাপড়া ও কৃষি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করে তাদের শিক্ষিত করবার চেষ্টা করবে। জমির উর্বরতা কেন কমে, কি করে তা বাড়ান যায়, একই জমিতে বিভিন্ন শস্য চাষ করার প্রয়োজনীয়তা কি, কি করে পতঙ্গ-পঙ্গপালের হাত থেকে ফসল রক্ষা করা যায়—এই সমস্ত কথা সমিতির সভা ডেকে আলোচনার দ্বারা চাষীদের বোঝান উচিত। চাষীদের তোমরা উৎসাহ দেবে, যাতে তারা ফসল উৎপাদনের নতুন নতুন পদ্ধতি চিন্তা ও পরীক্ষা করে দেখে, যাতে তারা নিজেদের সংঘশক্তিতে আস্থাবান হয়। এর ফলে দেখবে, পরস্পরের সহায়তায় তোমাদের অঞ্চলে চাষ-আবাদের অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে।

এই সব কিছুর সঙ্গে সঙ্গে কৃষির উন্নতির জন্য বিজ্ঞান-সংক্রান্ত সকল কথা ভালভাবে ব্যাখ্যা করে খুব সোজা ভাষায় প্রচারপত্রের আকারে চাষীদের মধ্যে বিলি করার ব্যবস্থা করবে। চাষ-আবাদ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য, দৈনিক আবহাওয়া, কোন্ জমিতে কখন কি ফসল বোনা উচিত, কি সার দেওয়া উচিত,

চাষের অন্যান্য দৈনন্দিন সমস্যা, আধুনিক ব্যবস্থায় বিদেশের উন্নত কৃষিকার্যের বর্ণনা, ইত্যাদি বিষয়গুলিই হবে প্রচারপত্রের আলোচনার বিষয়। এইভাবে কাজ করে চললে দেখবে, ধীরে ধীরে কৃষকের মন বিজ্ঞানমুখী হয়ে উঠবে।